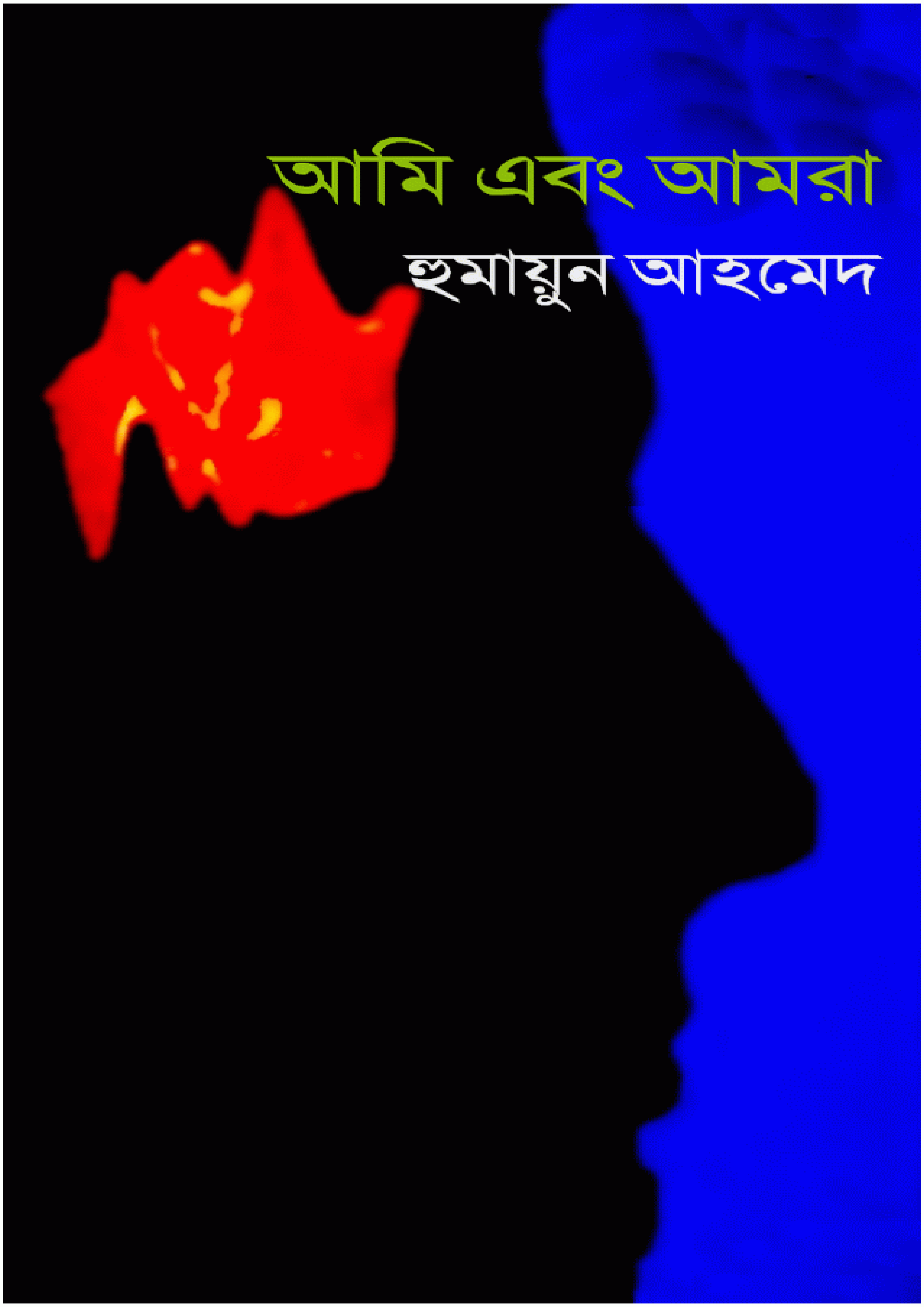
আমি এবং আমরা
হুমায়ুন আহমেদ

১

মিসির আলি দু শ গ্রাম পাইজং চাল কিনে এনেছেন। চাল রাখা হয়েছে একটা হরলিক্সের কৌটায়। গত চারদিন ধরে তিনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। চায়ের চামচে তিন চামচ চাল তিনি জানালার পাশে ছড়িয়ে দেন। তারপর একটু আড়াল থেকে লক্ষ করেন—কী ঘটে। যা ঘটে তা বিচিত্র। অন্তত তাঁর কাছে বিচিত্র বলেই মনে হয়। দুটা চড়ুই পাখি চাল খেতে আসে। একটি খায়, অন্যটি জানালার রেলিঙে গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে থাকে। ব্যাপারটা রোজই ঘটছে। পক্ষী সমাজে পুরুষ স্ত্রী পাখির চেয়ে সুন্দর হয়, কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে পাখিটি চাল খাচ্ছে সেটা পুরুষ পাখি। গম্ভীর ভঙ্গিতে যে বসে আছে, সে তার স্ত্রী কিংবা বান্ধবী। পক্ষী সমাজে বিবাহ প্রথা চালু আছে কিনা মিসির আলি জানেন না। একটি পুরুষ পাখি একজন সঙ্গিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, না সঙ্গিনী বদল করে—এই ব্যাপারটা মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করছে। জানেন না। পক্ষী বিষয়ক প্রচুর বই তিনি যোগাড় করেছেন। বইগুলোতে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এই জরুরি বিষয়টা নেই।

পাবলিক লাইব্রেরিতে পুরোনো একটি বই পাওয়া গেল—ইরভিং ল্যাংস্টোনের 'The Realm of Birds'. সেখানে পাখিদের বিচিত্র স্বভাবের অনেক কিছুই লেখা, কিন্তু কোথাও নেই একটি পাখি খাবে, অন্যটি দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। রহস্যটা কী? এই পাখিটির কি খিদে নেই? নাকি সে এক ধরনের উপবাসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে? পক্ষী বিশারদরা কী বলেন? বিশারদদের ব্যাপারে মিসির আলির এক ধরনের এ্যালার্জি আছে। বিশেষজ্ঞদের কিছু জিজ্ঞেস করলেই তাঁরা এমন ভঙ্গিতে তাকান যেন প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায় খুব বিরক্ত হচ্ছেন। প্রশ্ন পুরোপুরি না শুনেই জবাব দিতে শুরু করেন। সেই জবাব বেদবাক্যের মতো গ্রহণ করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের জবাবের ওপর প্রশ্ন করা যাবে না। বিনয় নামক সদ্‌গুণটি বিশেষজ্ঞদের নেই। দীর্ঘদিন পড়াশোনা করে তাঁরা যা শেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি শেখেন—অহংকার প্রকাশের কায়দাকানুন। পাখির ব্যাপারটাই ধরা যাক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপকের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক সমস্যা পুরোপুরি না শুনেই বললেন, এটা কোনো ব্যাপার না। খিদে নেই তাই খাচ্ছে না, পশু ও প্রাণিজগতের নিয়ম হল খিদেয় খাদ্য গ্রহণ করা। একমাত্র মানুষই খিদে না থাকলেও লোভে পড়ে খায়।

For More Book Download Go To www.missabook.com

মিসির আলি বললেন, প্রতিদিন একটা পাখির খিদে থাকবে না, অন্য একটার থাকবে—এটা কি যুক্তিযুক্ত?

'একটা বিশেষ পাখিই যে খাচ্ছে না তাইবা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন? সব পাখি দেখতে এক রকম। একদিন একটা খাচ্ছে, অন্যদিন আরেকটা খাচ্ছে।'

'আমি পাখি দুটাকে চিনি। খুব ভালো করে চিনি। অসংখ্য চড়ুই পাখির মধ্যেও আমি এদের আলাদা করতে পারব।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ গা দুলিয়ে হাসলেন। তারপর ছোট শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন—একটা মশা আপনার গায়ে কামড় দিল, তারপর সেটা উড়ে গিয়ে অন্য মশাদের সঙ্গে মিশল। আপনি কি সেই মশাটা আলাদা করতে পারবেন?

'না।'

'যদি না পারেন তা হলে চড়ুই পাখিও আলাদা করতে পারবেন না। পুরুষ চড়ুই এবং মেয়ে চড়ুই দেখতে এক রকম। ভাই, এখন আপনি যান। এগারোটার সময় আমার ক্লাস, আমি কিছুক্ষণ পড়াশোনা করব।'

ভদ্রলোক মিসির আলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডিকশনারি সাইজের এক বই খুলে পড়তে শুরু করলেন। ভাবটা এরকম যে আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় তাঁর নেই। দেখা যাচ্ছে, সবাই ব্যস্ত। সবারই সময়ের টানাটানি। একমাত্র তাঁরই অফুরন্ত সময়। সময় কাটানোই তার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুই করার নেই। মিসির আলির ডাক্তার তাঁকে বলেছেন—একজন মানুষের শরীরে যত ধরনের সমস্যা থাকা সম্ভব তার সবই আপনার আছে। লিভারের প্রায় পুরোটাই নষ্ট করে ফেলেছেন। অগ্ন্যাশয় থেকে সিক্রেশন হচ্ছে না। রক্তে ডাবলিউ বিসি-র পরিমাণ খুব বেশি। আপনার হার্টেরও সমস্যা আছে, ড্রপ বিট হচ্ছে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল—দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকা। বুঝতে পারছেন?

'পারছি।'

'সিগারেট ছেড়েছেন?'

'এখনো ছাড়ি নি তবে শিগগিরই ছাড়ব।'

'উপদেশ দিতে হয় বলে দিচ্ছি। মনে হয় না আপনি আমার উপদেশের প্রতি কোনো রকম গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারপরেও বলি—মন থেকে সমস্ত সমস্যা ঝেঁটিয়ে দূর করুন। যা করবেন তা হল বিশ্রাম। গান শুনবেন, পার্কে বেড়াবেন, হালকা বইপত্র পড়তে পারেন। রাত জাগা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মনে থাকবে?'

'জি থাকবে।'

'আমি জানি আপনি এর কোনোটাই করবেন না।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমি আপনার উপদেশ মেনে চলব। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে যে উপদেশ মানব তা না। শরীরটা সত্যি সত্যি সারাতে চাচ্ছি। অসুস্থতা অসহ্য বোধ হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি মুখে বলছেন কিন্তু আসলে কিছুই করবেন না। কিছু কিছু মানুষ আছে অন্যের উপদেশ সহ্য করতে পারে না। আপনি সেই দলের।

For More Book Download Go To www.missabook.com

ডাক্তারের কথা ভুল প্রমাণিত করে মিসির আলি ডাক্তারের উপদেশ মতোই চলছেন। রাত নটার মধ্যেই ভাত খান, দশটা বাজতেই শুয়ে পড়েন। সমস্যা হল—ঘুম আসে না। মানুষ কম্পিউটার না। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব না। মিসির আলি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। এক এক রাতে এক এক ধরনের বিষয় নিয়ে ভাবেন। ইচ্ছে করে যে ভাবেন তা না। ভাবনাগুলোর যেন প্রাণ আছে, তারা নিজেরাই আসে। মিসির আলিকে বিরক্ত করে তারা যেন এক ধরনের আনন্দ পায়। ইদানীং তিনি চড়ুই পাখি নিয়ে ভাবেন। পাখি মানুষ চিনতে পারে কি পারে না এই তাঁর রাতের চিন্তার বিষয়। কোনো মানুষ যদি রোজ রোজ পাখিকে খাবার দেয় তা হলে সেই পাখিগুলো কি ঐ মানুষটিকে চিনে রাখবে?

রাতে ঘুমের ঠিক না থাকলেও তাঁর ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। ঘুম ভেঙে পার্কে বেড়াতে যান। দুপুরে খাওয়ার পর দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। বিকেলে পার্কে গিয়ে বসেন। তার বসার নির্দিষ্ট বেঞ্চ আছে। পা তুলে বেঞ্চিতে বসে তিনি গাছপালার সৌন্দর্য দেখতে চেষ্টা করেন, যদিও গাছপালা তাকে কখনোই আকৃষ্ট করে না। ডাক্তার হালকা বই পড়তে বলেছে। তিনি 'হাসি হাসি হাসি' এই নামে একটা তিন শ পৃষ্ঠার বই কিনে এনেছেন। বইটিতে দু হাজার একটি 'জোক' আছে। তিনি প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়ে পড়ে এখন তেত্রিশ পৃষ্ঠায় এসেছেন—এখনো তাঁর হাসি আসে নি। এই বইটির দাম পড়েছে এক শ টাকা। মনে হচ্ছে এক শ টাকাই পানিতে গেছে।

আরেকটি বই ফুটপাত থেকে কিনেছেন দু টাকা দিয়ে। বইটির নাম বেহুলার বাসরঘরের ইতিহাস। এই বইটি বরং ভালো। অনেক চিন্তাভাবনা করার ব্যাপার আছে। যেমন লখিন্দরের বাবার নাম চাঁদ সদাগর। চাঁদ সদাগর সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

কালীদহে পড়ে চাঁদ পান করে জল
ক্ষণকাল যায় ভেসে ক্ষণে হয় তল।
সপ্তদিন নবম রাত্রি ভাসিল সাগরে
ইচামাছ বাসা বাঁধে দাড়ির ভিতরে...।

অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের দাড়িতে ইচামাছ বাসা বেঁধেছে। সাগরের ইচামাছ হচ্ছে গলদা চিংড়ি। এরা কী করে দাড়ির ভেতর বাসা বাঁধবে? রূপক অর্থে বলা হচ্ছে? রূপকের চিত্রকল্প তো বাস্তব হওয়া উচিত। অবাস্তব চিত্রকল্প দিয়ে রূপক তৈরি করার মানে কী? তা ছাড়া "সপ্তদিন নবম রাত্রি ভাসিল সাগরে" বাক্যটির মানেই বা কী? সপ্তদিন সাগরে ভাসলে সপ্তরাতও ভাসতে হবে। অবিশ্যি শুরুতে এক রাত ভেসেছে এবং শেষে এক রাত ভেসেছে এই ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাতেও শেষ রক্ষা হয় না, কারণ চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবি রাতে হয় নি। হয়েছে দিনে।

মিসির আলি পার্কে তাঁর নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে আছেন। তাঁর পাশে দুটি বই। একটি হল বেহুলার বাসরঘরের ইতিহাস, অন্যটি—The Birds, Their habits. তিনি বই পড়ছেন না। বেশ আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখছেন। বাচ্চারা ফুটবল খেলছে। ফুটবল খেলার মতো ফাঁকা জায়গা এই পার্কে নেই। চারদিকে গাছগাছালি। এর মধ্যেই বাচ্চারা

খেলছে। কে কোন দলে খেলছে এটা বের করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেরাও যার যেদিকে ইচ্ছা বলে কিক বসাচ্ছে। নির্ধারিত কোনো গোলপোস্ট আছে বলেও মনে হচ্ছে না। গোলকিপার যে দুটি গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়াচ্ছে সেটাই গোলপোস্ট। বলের সঙ্গে সঙ্গে গোলপোস্টের স্থান বদল হচ্ছে।

'স্লামালিকুম স্যার।'

মিসির আলি না তাকিয়েই বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি স্যার?'

'এখন বলতে পারেন না। এখন আমি খেলা দেখছি।'

'স্যার, আমি বসি না হয়।'

'বসুন।'

অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলল। কে জিতল কে হারল কিছু বোঝা গেল না। মনে হচ্ছে দু দলই জিতেছে। এও এক অসাধারণ ঘটনা। একসঙ্গে দুটি দলকে জিততে প্রায় কখনোই দেখা যায় না।

'স্যার, আমি অনেকক্ষণ বসে আছি।'

মিসির আলি তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হল। মানুষের সঙ্গ তাঁর কাছে কখনোই বিরক্তিকর ছিল না। অতি সাধারণ যে মানুষ তার চরিত্রেও অবাক হয়ে লক্ষ করার মতো কিছু ব্যাপার থাকে। কিন্তু ইদানীং মানুষ তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছে। বরং চড়ুই পাখির ব্যাপার তাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করছে। তাঁর পাশে বসে থাকা চশমা পরা মানুষটি মাঝে মাঝেই তাঁকে বিরক্ত করছে। তাকে এই পার্কেই দেখা যায়। সবদিন না, কয়েকদিন পরপর। এই লোক তাঁকে একটা গল্প বলতে চায়। তাও প্রেমের গল্প। পার্কে বসে প্রেমের গল্প শোনার মতো ধৈর্য এবং ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর নেই। এ লোককে সে কথা অনেকবারই বলা হয়েছে। মিসির আলি ঠিক করলেন, আজ আরেক বার বলবেন। প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন—তারপর কঠিন এবং রূঢ়ভাবে বলবেন।

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ, এখন বলুন কেমন আছেন?

কঠিন কথা বলার আগে সহজভাবে শুরু করা। বুদ্ধিমান লোক হলে বুঝে ফেলা উচিত যে প্রস্তাবনা মূল বইয়ের মতো নয়।

'জি স্যার, ভালো আছি।'

'গল্প শোনাতে চাচ্ছেন তো? কিছু মনে করবেন না। গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'আপনার চড়ুই পাখি দুটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম।'

'চড়ুই পাখি?'

'জি স্যার, পরশুদিন আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, আপনি আমার কোনো কথা শুনতে পারবেন না। চড়ুই পাখি নিয়ে ব্যস্ত। পাখি দুটি কি ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে।'

'এখনো কি পুরুষ পাখিটা খাচ্ছে এবং মেয়ে পাখি দূরে বসে দেখছে?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছি। আমার মনে হয় পাখি দুটাকে যদি আমরা খাঁচায় আটকে ফেলতে পারি তা হলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী? খাঁচায় চাল

দেওয়া থাকবে—ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা মনিটর করা হবে। যদি দেখা যায় খাঁচার ভেতরও মেয়ে পাখিটা কিছুই খাচ্ছে না—তখন বুঝতে হবে...'

মিসির আলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাঁচায় এদের ঢোকাব কী করে?'

'খাঁচায় ঢোকানো সমস্যা হবে না, স্যার। চাল খাইয়ে খাইয়ে আপনি এদের অভ্যস্ত করে রেখেছেন— খাঁচার দরজা খুলে আপনি যদি এর ভেতর চাল দিয়ে দেন—পাখি দুটা খাঁচায় ঢুকবে।'

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে বললেন, খাঁচা কোথায় পাওয়া যায়?

'নীলক্ষেতে ইউনিভার্সিটি মার্কেট নামে একটা নতুন মার্কেট হয়েছে। রঙিন মাছ, পাখি, পাখির খাঁচার অসংখ্য দোকান।'

'খাঁচার কী রকম দাম?'

'আপনি যদি বেয়াদবি না নেন—আমি আপনার জন্যে বড় একটা খাঁচা কিনেছি। আপনার বাসায় যে কাজের ছেলেটি আছে তাকে দিয়ে এসেছি।'

'কেন করলেন?'

'আপনার ভেতর কৌতূহল জাগানোর জন্যে করেছি। আমি বেশ কিছুদিন ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি কোনোরকম আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এমনকি আমার নাম পর্যন্ত জানতে চাচ্ছেন না। আমার ধারণা হয়েছে খাঁচাটা পেলে হয়তোবা আপনি কৌতূহলী হবেন। আমার নাম জানতে চাইবেন।'

'আপনার নাম কী?'

'আমার ডাকনাম তন্ময়। ভালো নাম মুশফেকুর রহমান।'

'আপনি আমার কাছে কী চান?'

'আমি আপনাকে একটা গল্প বলতে চাই।'

'প্রেমের গল্প?'

'প্রেমের গল্প বলা যেতে পারে।'

মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়—আমি প্রেমের গল্প শোনার ব্যাপারে খুব আগ্রহী?

'হ্যাঁ, মনে হয়। আমার মনে হয় গল্প শুরু করলে আপনি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুরু করবেন। আমার দরকার অসম্ভব মনোযোগী একজন শ্রোতা। যে গল্প শুনে যাবে। একটি প্রশ্নও করবে না। গল্প শুনে হাসবে না, ব্যথিত হবে না।'

'এমন শ্রোতা তো প্রচুর আছে। এই পার্কেই আছে।'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি। আপনি বলতে চাচ্ছেন—এই পার্কে প্রচুর গাছ আছে। গাছগুলো আমার গল্পের মনোযোগী শ্রোতা হতে পারে। আপনি কি তাই বোঝাতে চাচ্ছেন না?'

'হ্যাঁ।'

'গাছকে আমি আমার গল্প শুনিয়েছি। গাছরা আমার গল্প মন দিয়ে শুনেছে এবং গল্পের মাঝখানে প্রশ্ন করে আমাকে বিরক্ত করে নি। কিন্তু ওরা আমার গল্প বুঝতে পেরেছে কি না তা আমি জানতে পারছি না।'

'আপনার গল্প বোঝা কি গাছদের জন্যে জরুরি?'

‘গাছের জন্যে জরুরি নয়। আমার জন্যে জরুরি। খুবই জরুরি।’

‘প্রেমের গল্পটি কি দীর্ঘ?’

‘গল্প বেশ দীর্ঘ। তবে গল্পের মূল লাইনটি যাকে বটম লাইন বলা হয় তা ছোট। স্যার, বটম লাইনটি বলব?’

‘বলুন।’

‘আমি আপনাদের মনোবিদ্যার ভাষায় একজন সাইকোপ্যাথ। আমি এ পর্যন্ত দুটি খুন করেছি। খুব ঠাণ্ডা মাথায় করেছি। খুব ভেবেচিন্তে করা। এই খুন দুটি করার জন্যে আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। আমি তৃতীয় খুনটির প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছি। প্রস্তুতিপর্ব আপনাকে বলতে চাচ্ছি। প্রস্তুতিপর্বে প্রেমের ব্যাপার আছে। এই জন্যেই বলছি প্রেমের গল্প।’

‘দুটি খুন করেছেন। তৃতীয়টি করবেন। করে ফেলুন। আমাকে বলার দরকার কী? আমার অনুমতি নেওয়ার ব্যাপার তো নেই।’

‘স্যার, আপনি কি আমার গল্প বিশ্বাস করেছেন?’

‘হ্যাঁ করেছি।’

‘আমি তো আপনাকে একটা ভয়াবহ কথা বললাম। আপনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করলেন?’

‘হ্যাঁ করলাম।’

‘কেন করেছেন?’

‘আমি মানুষকে কখনোই অবিশ্বাস করি না। তা ছাড়া একজন মানুষ অকারণে কেন আমাকে এসে বলবে আমি দুটা খুন করেছি, তৃতীয়টি করব? এখন বলুন কেমন লাগে মানুষ খুন করতে?’

‘ভালো লাগে স্যার।’

লোকটি হেসে ফেলল। সুন্দর হাসি। কিন্তু মিসির আলি শিউরে উঠলেন। লোকটির জিহ্বা কুচকুচে কালো। সে যখন হেসে উঠল মিসির আলি ব্যাপারটা তখনই লক্ষ্য করলেন।

লোকটি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি আপনার ভেতর কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছি। কাজেই আমি জানি আপনি এখন আমার কথা শুনবেন। আর স্যার, আপনি আমার জিহ্বা দেখে যেভাবে চমকে উঠেছেন সেভাবে চমকে ওঠার কিছু নেই। খুব ছোটবেলায় আমার অসুখ হয়েছিল। কালাজ্বর। ব্রহ্মচারী ইনজেকশন নিতে হয়েছে। সেইসঙ্গে আয়ুর্বেদি এক ওষুধ খেয়ে জিহ্বা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। স্যার যাই। খুব শিগগিরই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ও ভালো কথা, স্যার এই বইটিও আমি আপনার জন্যে এনেছি। অস্ট্রেলিয়ান পাখিদের ওপর একটা বই। পাখিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য এই বইটিতে পেতে পারেন।

‘আপনার ভালো নাম কী যেন বললেন? মুশফেকুর রহমান?’

‘জি।’

‘আপনার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হবে? আপনার ঠিকানা কী?’

‘আমাকে আপনার খুঁজে বের করতে হবে না, স্যার। আমিই আপনাকে খুঁজে বের করব।’

২

মিসির আলির কাজের ছেলেটির নাম বদু। বয়স পনের–ষোল। বামন ধাঁচ আছে, লম্বা হচ্ছে না। ছেলেটা বোকা ধরনের, তবে অত্যন্ত অনুগত। রাতে মিসির আলির বাড়ি ফিরতে দেরি হলে চিন্তিত মুখে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুদিন পরপর 'এত কম বেতনে কাম করমু না' বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। মিসির আলি তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করছেন। গত তিন মাসে সে 'অ' 'আ' এবং 'ই' পর্যন্ত শিখেছে। তাও ভালোমতো শিখতে পারে নি। অ এবং আ-তে গণ্ডগোল হচ্ছে। কোনটা অ, কোনটা আ, এখনো ধরতে পারে না। তার পরেও পড়ালেখার কাজটি সে খুব আগ্রহ নিয়ে করে।

মিসির আলি ঘরে ঢুকে দেখলেন বদু পড়ছে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছে। বই শ্লেট পেনসিল চারদিকে ছড়ানো। মিসির আলি বললেন, কেউ কি পাখির খাঁচা দিয়ে গেছে?

বদু বলল, হ। সুন্দরমতো একটা লোক আইছিল।

'লোকটা কী বলল?'

বলছে, "বদু, খাঁচাটা রাখো। স্যার এলে তাঁর হাতে দিও। আর এই নাও একটা চিঠি।"

বদু কথাগুলো হুবহু বলে গেল। মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বদু মুশফেকুর রহমানের কথাগুলো যন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে। স্মৃতিশক্তির কোনো সমস্যা এখানে হচ্ছে না অথচ সামান্য আ অ, তার মনে থাকছে না। এর কারণটা কী?

'তোকে বলল, বদু ! খাঁচাটা রাখো?'

'জে বলছে।'

'তোর নাম জানল কীভাবে?'

'তা ক্যামনে কব। হে তো আমারে বলে নাই।'

'তুই অবাক হোস নি। অপরিচিত একটা লোক তোর নাম ধরে ডাকছে।'

'জে না, অবাক হব ক্যান? তার ইচ্ছা হইছে ডাকছে। নাম ধইরা ডাকলে দোষের কিছু নাই।'

মিসির আলি ঘরে ঢুকে খাঁচা দেখলেন। বেশ বড় লোহার খাঁচা। সাদা রঙ করা হয়েছে। রঙ এখনো শুকায় নি। হাতে লেগে যাচ্ছে। খামে ভরা নোটটাও তিনি পড়লেন—আপনার পক্ষীবিষয়ক গবেষণার সাফল্য কামনা করছি। বল পয়েন্টের লেখা নয়—কলমের লেখা। দামি কলম নিশ্চয়ই। মসৃণ লেখা। যে কাগজে লেখা হয়েছে সে কাগজও দামি, কোনো প্যাড থেকে ছেঁড়া হয়েছে। ক্রিম কালারের প্যাড। প্যাডের পাতা থেকে হালকা গন্ধ আসছে। মিসির আলিকে সবচেয়ে মুগ্ধ করল হাতের লেখা। অনেকদিন তিনি এত সুন্দর হাতের লেখা দেখেন নি। অক্ষরগুলো আলাদা আলাদাভাবে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

'বদু!'

'জে।'

'লোকটা কি খাঁচা দিয়েই চলে গেল, না কিছুক্ষণ ছিল?'

‘কিছুক্ষণ ছেল—গল্পসল্প করল।’

‘কী গল্প করল?’

‘আমার বড়ি কই, কতদিন আপনের সঙ্গে আছি এই হাবিজাবি। আমিও দুই-চাইরটা হাবিজাবি কথা বললাম।’

‘হাবিজাবি কথা কী বললে?’

‘যেমন ধরেন লেহাপড়া কিছু মনে থাকে না। কোনটা স্বরে অ কোনটা স্বরে আ খালি গোলমাল হয়। তখন লোকটা একটা নিয়ম শিখাইয়া দিল। বলছে, এই নিয়মে পড়লে মনে থাকবে।’

‘নিয়মটা কী?’

‘স্বরে অ হইল হাতের মুঠি বন্ধ। স্বরে অ বলনের সময় হাতের মুঠি বন্ধ করণ লাগব। স্বরে আ হইল মুঠি খোলা। নিয়মটা ভালো—অখন আর ভুল হয় না।’

‘লোকটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখেছিস বদু?’

‘জে না।’

‘ভালো করে মনে করে দেখ। লোকটা কথা বলার সময় হেসেছে?’

‘জে হাসছে।’

‘হাসি দেখে অদ্ভুত কিছু মনে হয়েছে?’

‘জে না।’

মিসির আলি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় উঠলেন। মুশফেকুর রহমানের দেওয়া পাখিবিষয়ক বইটির পাতা উল্টালেন। নতুন বই। খুব সম্ভব আজই কেনা হয়েছে। বইয়ের দাম পঁচাত্তর পাউন্ড। বইটির প্রথম পাতায় ঠিক আগের মতো লেখা—“আপনার পক্ষীবিষয়ক গবেষণার সাফল্য কামনা করছি।” মিসির আলি আবারো মনে মনে বললেন, কী সুন্দর হাতের লেখা! তিনি সত্যি সত্যি লেখাগুলোর ওপর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে গেলেন।

লোকটি সম্পর্কে মিসির আলি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করলেন। বিত্তবান মানুষ—তা ধরে নেওয়া যায়। পঁচাত্তর পাউন্ড দামের বই উপহার দেওয়া, খাঁচা কিনে আনার কাজগুলো একজন বিত্তমান মানুষই করবে।

মুশফেকুর রহমান তাঁকে কৌতূহলী করবার জন্যে খাঁচা উপহার দিয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল না। একবার হাঁ করলেই মিসির আলি তার সম্পর্কে কৌতূহলী হতেন। তা করে নি। মিসির আলি যখন কৌতূহলী হয়েছেন, তখনই সে তার ভয়ংকর জিহ্বা দেখিয়েছে, তার আগে না। সে তার শরীরের এই অস্বাভাবিকতা গোপন রাখতে পারে। এই ক্ষমতা তার আছে। সে বদুর সঙ্গে অনেক গল্প করেছে। বদু তার কালো জিহ্বা দেখতে পায় নি। ইচ্ছা করলে মিসির আলির কাছেও গোপন রাখতে পারত। তা রাখে নি। তার মনে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী? সে কি ভয় দেখাতে চেয়েছে, না চমকে দিতে চেয়েছে?

চমকে দেওয়ার একটা প্রবণতা লোকটির মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। পাখির খাঁচা কিনে আনায় তাই প্রমাণিত হয়। বদুকেও সে চমকে দিতে চেয়েছে তার নাম ধরে ডেকে। বদুর চমকাবার মতো বুদ্ধি নেই বলে চমকায় নি। মুশফেকুর রহমান যে অসম্ভব বুদ্ধিমান

এই ব্যাপারটিও সে জানাতে চায়। মনে রাখার একটি কৌশল সে বদুকে শিখিয়েছে। তার মূল লক্ষ্য বদু নয়, মূল লক্ষ্য মিসির আলি। যেন সে বলার চেষ্টা করছে বুদ্ধির খেলায় তুমি আমাকে হারাতে পারবে না। অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ সব সময় এই ছেলেমানুষিটা করে। তাদের বুদ্ধির ছটায় অন্যকে চমকে দিতে চায়। মিসির আলি নিজেও এই কাজটি করেন—খুব সূক্ষ্মভাবে করেন। এই লোকটিও সূক্ষ্মভাবেই করছে।

সে বলল, আমি একজন সাইকোপ্যাথ। সাইকোপ্যাথ শব্দের মানে সে কি জানে? পত্রপত্রিকা এবং সিনেমার কল্যাণে শব্দটি প্রচলিত, যদিও এই শব্দের ব্যাপকতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে।

সে দুটি খুনের কথা বলছে—একজন সাইকোপ্যাথ তা করবে না। উপন্যাসের সাইকোপ্যাথরা বড় গলায় সবাইকে খুনের কথা বলে। বাস্তবের চরিত্র হবে নিভৃতচারী।

লোকটির মধ্যে অনুসন্ধিৎসাও প্রবল। পাখির চাল না খাওয়ার ব্যাপারটা তাকেও বিস্মিত করেছে। সে রহস্য নিয়ে ভাবছে। কারণ পাখির বইটি সে শুধু কেনে নি, পড়েছেও। বইয়ের বিভিন্ন পাতায় পেজ মার্ক দেওয়া। বইটি পড়তে হলে তাকে অনেকখানি সময় দিতে হবে। আচ্ছা, পাখির কথা তিনি তাকে কবে বললেন? পরশু না তার আগের দিন? আচ্ছা, এই বইটিতে কি লোকটির হাতের ছাপ আছে?

মিসির আলি চিন্তিত বোধ করছেন। তাঁকে আরো ভালোভাবে ভাবতে হবে। আরো ঠাণ্ডা মাথায়। মোটেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না। প্রথম লোকটির সঙ্গে কোথায় দেখা হল—পার্কে না রাস্তায়? প্রথম দিন কী কথা হয়েছিল? আচ্ছা, প্রথমদিন তার গায়ে কি কাপড় ছিল? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। আজ কী কাপড় ছিল। কোট না স্যুয়েটার? কী রঙের কোট কিংবা কী রঙের স্যুয়েটার? অনেক চিন্তা করেও মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। এরকম কখনো হয় না। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ভালো। সারা জীবন তিনি তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখিয়ে অন্যদের চমৎকৃত করেছেন। নিজেও চমৎকৃত হয়েছেন। আজ পারছেন না কেন?

'বদু!'

'জি স্যার।'

'যে লোকটা এসেছিল, তার গায়ে কী ছিল? কোট?'

'খিয়াল নাই।'

'লোকটার গায়ের রঙ কী ছিল? ফর্সা না কালো?'

'খিয়াল নাই।'

মিসির আলি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন—শুধু যে বদুর খেয়াল নেই তা নয়, তাঁর নিজেরও খেয়াল নেই। এর কোনো মানে হয়? তিনি নিজের ওপর নিজে বিরক্ত হচ্ছেন।

রাতের খাবার খেলেন নিঃশব্দে। খাওয়া শেষে সিগারেট ধরালেন। সারা দিনে তিনি এখন একটাই সিগারেট খান। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে বদু এসে তার পড়া বলল। এই প্রথমবার সে স্বরে অ স্বরে আ-তে কোনো ভুল করল না। হাত মুঠিবদ্ধ করে বলল, স্বরে 'অ'। মুঠি খুলে বলল স্বরে 'আ'। বদু নিজের সাফল্যের আনন্দে হেসে ফেলল। ঠিক দশটায় মিসির আলি দশ মিলিগ্রাম ফ্রিজিয়াম খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে আছে। স্নায়ুকে ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। ঘুম এল না। মাথার মধ্যে ঘুরতে

লাগল মুশফেকুর রহমান। লোকটার গায়ের রঙ মনে নেই কেন? কী কাপড় পরে এসেছিল তাও মনে নেই। এর কারণ কী? যুক্তি দিয়ে এই সমস্যার কাছে কি পৌঁছা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। সেই চেষ্টাই করা যাক। একজন মানুষের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন তার চোখের দিকেই প্রথম তাকাই। তারপর তার মুখ দেখি, মাথার চুল দেখি। এক ফাঁকে সে কী কাপড় পরে এসেছে তা দেখি। যদি আমরা তার চোখ থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই তা হলে চোখ ছাড়া লোকটির আর কিছুই দেখা হয় না। চোখ থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার ব্যাপার কখন ঘটবে? তখনই ঘটবে যখন লোকটির চোখের তীব্র বিকর্ষণী ক্ষমতা থাকবে। চোখ কখন বিকর্ষণ করে? যখন চোখে কোনো সূক্ষ্ম অস্বাভাবিকতা থাকে।

মিসির আলি মনে মনে বললেন, মুশফেকুর রহমান নামের লোকটির চোখের অস্বাভাবিক বিকর্ষণী ক্ষমতার জন্যেই তাকে কখনো ভালোভাবে লক্ষ করা হয় নি। তাকে ভালোভাবে দেখার আগেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি তার কুৎসিত কালো 'জিব' দেখেছি—কারণ সে আমাকে ইচ্ছে করে তা দেখিয়েছে।

মিসির আলি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। সম্ভবত এখন তাঁর ঘুম আসবে। হাই উঠছে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে তাঁর সুনিদ্রা হল। শেষরাতের দিকে পাখি নিয়ে কিছু ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন দেখলেন। একটি স্বপ্নে চড়ুই পাখি দুটি তাঁর সঙ্গে কথা বলল। মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, মিসির আলি সাহেব, শরীরের হাল অবস্থা ভালো?

তিনি বললেন, জি-না, ভালো না।

'রোজ খানিকটা পাইজং চাল খাবেন। চা চামচে এক চামচ। খালি পেটে।'

'জি আচ্ছা, খাব।'

স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলি নিজেকে বোঝালেন—এ জাতীয় স্বপ্ন দেখার পেছনে যুক্তি আছে। তিনি ক্রমাগত পাখি নিয়ে ভাবছেন বলেই এরকম দেখছেন। এ জগতে যুক্তিহীন কিছু ঘটে না। অযুক্তি হল অবিদ্যা। এ পৃথিবীতে অবিদ্যার স্থান নেই।

৩

তাঁর পাখিবিষয়ক গবেষণা বেশিদূর এগুচ্ছে না। চড়ুই পাখি দুটি খাঁচায় ঢুকছে না। মিসির আলি খাঁচাটা জানালার পাশে রেখেছেন। খাঁচার ভেতরে পিরিচ ভর্তি চাল। পাখি দুটি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাল দেখছে তবে সাহস করে এগুচ্ছে না। তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাদের সাবধান করে দিচ্ছে। বলে দিচ্ছে এই খাঁচার ভেতর না ঢুকতে। একটি চড়ুই পাখির মস্তিষ্কের পরিমাণ কত? খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম। মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম মস্তিষ্ক নিয়েও সে বিপদ আঁচ করতে পারে। মানুষ কিন্তু পারে না। সিক্সথ সেন্স মানুষের ক্ষেত্রে তেমন প্রবল নয়।

সারাটা দিন মিসির আলি পাখির পেছনেই কাটালেন। পাখি দুটির আজ হয়তো কোনো কাজকর্ম নেই। এরা খাঁচার আশপাশেই রইল, অন্যদিনের মতো চলে গেল না। মিসির আলিও সময় কাটাতে লাগলেন বিছানায় আধশোয়া হয়ে। তিনি এমনভাবে

শুয়েছেন যেন প্রয়োজনে চট করে উঠে খাঁচার দরজা বন্ধ করতে পারেন। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার ভানও করলেন। পাখি দুটি তাতে প্রতারিত হল না।

সন্ধ্যাবেলা তিনি গেলেন পার্কে। শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা পার্কে লোকজন হাওয়া খেতে যায় না। পার্ক থাকে খালি। এই সময় হাঁটতে ভালো লাগে। সন্দেহজনক কিছু লোকজনকে অবিশ্যি দেখা যায়। তারা কুটিল চোখে বারবার তাকায়। একবার চাদর গায়ে একজন মধ্যবয়স্ক লোক তাঁর খুব কাছাকাছি এসে গম্ভীর গলায় বলেছিল—সব খবর ভালো? তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছেন, জি ভালো। লোকটি এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গিয়েছিল। মিসির আলি পার্কে সেজেগুজে থাকা কিছু মেয়েকেও দেখেন। সাজ খুবই সামান্য—কড়া লিপস্টিক, গালে পাউডার এবং রোজ, চোখে কাজল। তারা ঘোরাফেরা করে অন্ধকারে। অন্ধকারে তাদের সাজসজ্জা কারোর চোখে পড়ার কথা না। এরা কখনো মিসির আলির কাছে আসে না। তবে তিনি এদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করেন। তিনি ঠিক করে রেখেছেন এদের কেউ যদি কখনো তাঁর কাছে আসে তিনি তাকে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসবেন, তার তীব্র দুঃখ ও বেদনার কথা মন দিয়ে শুনবেন। তাঁর খুব জানতে ইচ্ছা করে—এই মেয়েগুলো জীবনের চরমতম গ্লানির মুহূর্তগুলো কীভাবে গ্রহণ করেছে? এ সুযোগ এখনো তাঁর হয় নি।

পার্কে তিনি ঘণ্টাখানেক হাঁটলেন। কুড়ি মিনিটের মতো তাঁর পরিচিত প্রিয় জায়গায় পা তুলে বসে রইলেন। পার্কটার একটা বড় সমস্যা হল—গাছগাছালি খুব বেশি, আকাশ দেখা যায় না। তাঁর আজকাল খুব ঘন ঘন আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সবারই বোধহয় এরকম হয়—বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টি যায়।

প্রকৃতি মানুষের জিনে অনেক তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে না, কিংবা চায় না। তার যা বলার তা সে বলে দিয়েছে, লিখিতভাবেই বলেছে। সেই লেখা আছে 'জিনে'—ডিএনএ এবং আরএনএ অণুতে। মানুষ সেই লেখার রহস্যময়তা জানে কিন্তু লেখাটা পড়তে পারছে না। একদিন অবশ্যই পারবে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মিসির আলির উঠতে ইচ্ছা করছে না। তিনি অপেক্ষা করছেন মুশফেকুর রহমান নামের লোকটির জন্যে। যদিও তিনি জানেন সে আজ আসবে না। কারণ মুশফেকুর রহমান জানে, মিসির আলি গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। রহস্যপ্রিয় মানুষ, নিজের রহস্য কখনো ভাঙবে না। আরো রহস্য তৈরি করবে। এই লোকটি তখনই তার কাছে আসবে—যখন মিসির আলি তার জন্যে অপেক্ষা করা বন্ধ করে দেবেন।

লোকটিকে খুঁজে বের করা কি কঠিন? মিসির আলির কাছে এই মুহূর্তে কাজটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। বিত্তবান লোক হলে তার একটা টেলিফোন থাকার কথা। গাড়ি থাকার কথা। গাড়ি রেজিস্ট্রেশন কী নামে হয়েছে তা বের করা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। গাড়ি না থাকলেও তার টিভি কিংবা রেডিও আছে। এদের জন্যেও লাইসেন্স করতে হয়। ঠিকানা আছে এমন মানুষকে খুঁজে পাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। বের করা যায় না শুধু ঠিকানাহীন মানুষদের।

'স্লামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'স্যার, আমি মুশফেকুর রহমান। আপনি আজ পার্কে আসবেন ভাবি নি। আমি ভেবেছিলাম আজ আপনি পাখিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।'

মিসির আলি স্বাভাবিক গলায় বললেন, পাখি দুটা ধরা পড়ে নি।

'ধরা না পড়ারই কথা। খাঁচায় কাঁচা পেইন্টের গন্ধ। এই গন্ধ পাখি সহ্য করতে পারে না। আপনি কয়েকদিন খাঁচাটাকে বাইরে ফেলে রাখুন। রঙের গন্ধ দূর হোক।'

মুশফেকুর রহমান মিসির আলির পাশে বসল। মিসির আলি তাকালেন কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। মিসির আলি বললেন, আমি আপনার কথা শোনার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে এসেছি। শুরু করুন।

'গল্প শোনার সময় আপনি কি আমার মুখ দেখতে চান না? অনেকে আবার মুখের দিকে না তাকিয়ে গল্প শুনতে পারে না, আবার বলতেও পারে না।'

'আপনি কি বলতে পারেন?'

'তা পারি। আমি আমার গল্প অন্ধকারেই বলতে চাই। আমার গল্প অন্ধকারের গল্প। কিন্তু স্যার, আপনার কি ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'লাগছে।'

'আমি একটা চাদর নিয়ে এসেছি। চাদর গাড়িতে রাখা আছে। আমার চাদর ব্যবহার করতে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

মুশফেকুর রহমান বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তার গায়ে চাদর। গায়ে চাদর থাকতেও সে আরেকটি চাদর নিয়ে এল কী জন্যে? তাঁর জন্যে কি এনেছে? সে কি নিশ্চিত ছিল, মিসির আলি এসে বসে থাকবেন? গল্প শুনতে চাইবেন, এবং সে গল্প শুনাবে শীতের রাতে?

তাই যদি হয় তা হলে সে শুধু চাদর আনে নি, ফ্লাস্কে করে চা এনেছে। কিছু খাবার এনেছে। মিসির আলি ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট খান। সেই সিগারেটও এক প্যাকেট এনেছে। চাদর যদি তাঁর জন্যে আনা হয় তা হলে চাদরটি হবে অব্যবহৃত, নতুন।

মুশফেকুর রহমান ফিরে এল। তার সঙ্গে ফ্লাস্ক। একটা প্যাকেটে পূর্বাণী কনফেকশনারির কিছু স্যান্ডউইচ। সে বসতে বসতে বলল, চাদরটা আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গায়ে দিন। এটি যদিও অনেক আগে কেনা, কখনো ব্যবহার করা হয় নি। দু বছর আগে জয়পুর গিয়েছিলাম, তখন কেনা। রাত বলেই দেখতে পাচ্ছেন না, চাদরের গায়ে রেশমি সুতার কাজ করা আছে। এরা বলে জয়পুরী কাজ। চাদরটা আপনার জন্যে আমার সামান্য উপহার।

'থ্যাংক ইউ। আমার ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট কোথায়?'

মুশফেকুর রহমান হাসল। হাসতে হাসতে বলল, সিগারেটও এনেছি। দেব?

'দিন এবং গল্প শুরু করুন।'

'কোথেকে শুরু করব? প্রথম খুন কীভাবে করলাম সেখান থেকে?'

'না, নিজের কথা বলুন। আপনার ছেলেবেলার কথা।'

মুশফেকুর রহমান ফ্লাস্কে চা ঢালতে ঢালতে গল্প শুরু করল—

আমার ছেলেবেলা মোটেই মজার নয়। গল্প করে বেড়াবার কিছু নেই। সব মনেও নেই—তবু বলছি।

আমি বড় হয়েছি পুরোনো ঢাকায়। অনেকের ধারণা নেই যে, পুরোনো ঢাকায় অসম্ভব বিত্তবান বেশকিছু মানুষ থাকেন। বাইরে থেকে তাঁদের অর্থ ও বিত্তের পরিমাণ বোঝা যায় না। আমাদের একেবারেই বোঝা যেত না। জেলখানার মতো উঁচু দেয়াল দেওয়া বাড়ি। গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকলে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। ফুলের বাগানটাগান নেই। এলোমেলোভাবে কয়েকটা বড় বড় দেশী ফুলের গাছ। চাঁপা গাছ, শিউলি গাছ, বাড়ির দক্ষিণ দিকে হাসনাহেনার প্রায় জঙ্গলের মতো ঝাড়। এই গাছগুলোতে কখনো ফুল ফোটে না। মাঝে মাঝে কেটে দেওয়া হয়। আবার আপনাতেই গজায়। বাড়ির পেছনে বেশকিছু ফলের গাছ। একটা আছে কামরাঙা গাছ। এই গাছে কিছু কামরাঙা হয়। অন্যগুলোতে ফল হয় না।। একটা পাতকুয়া আছে। মেঝে বাঁধানো। কুয়ার পানি খুব পরিষ্কার তবে বিশ্রী গন্ধ বলে সেই পানি ব্যবহার করা হয় না। বাড়িটা একতলা অনেক বড়। মূল বাড়ির উত্তরে কামরাঙা গাছের কাছে চার কামরার আলাদা একটা দোতলা বাড়ি। নিচে তিন কামরা, উপরে এক কামরা। দোতলাটাকে আমরা বলতাম—উত্তর বাড়ি। দোতলার পুরোটাই বলতে গেলে বারান্দা। ছেলেবেলায় আমার উত্তর বাড়িতে যাওয়া পুরোপুরি নিষেধ ছিল। কারণ উত্তর বাড়িতে থাকতেন বাবা। তিনি বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করতেন না। আমার বাবা পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিসই অপছন্দ করতেন। হইচই অপছন্দ করতেন, বাচ্চাকাচ্চা অপছন্দ করতেন, গান অপছন্দ করতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল গাড়ি অপছন্দ করতেন। কারণ গাড়ি স্টার্ট করলে ভটভট শব্দ হয়। যে কারণে আমাদের কোনো গাড়ি ছিল না। আমি স্কুলে যেতাম রিকশায়। আমাকে মাথা কামানো গাট্টাগোট্টা একটা লোক স্কুলে নিয়ে যেত। তার নাম ছিল সর্দার। আমি ডাকতাম সর্দার চাচা। তিনি কথায় কথায় বলতেন—এক টান দিয়া কইলজা ছিঁড়্যা বাইর কইরা ফেলামু। এমনভাবে বলতেন যেন তিনি কাজটা এক্ষুনি করবেন।

ধরুন, আমরা রিকশা করে যাচ্ছি। অন্য একটা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। আমার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি চলন্ত রিকশায় উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন—এক টান দিয়া কইলজা ছিঁড়্যা ফেলামু।

সর্দার চাচাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম। কিন্তু উনি আমাকে পছন্দ করতেন কি করতেন না কোনোদিন জানতে পারি নি। সর্দার চাচাকে আমার অপছন্দ করার কোনো কারণ ছিল না। পছন্দ করতাম, কারণ আমার আর কেউ ছিল না। বাবার সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ নেই। মা'র সঙ্গেও নেই। বাবা মাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। মা'র এই বাড়িতে আসা নিষেধ ছিল।

আমাকে লালনপালন, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে আনা সবই সর্দার চাচা করতেন। আমার জগৎ ছিল স্কুল এবং স্কুলের চার দেয়ালঘেরা আমাদের বাড়ি। স্কুল আমার ভালো লাগত না। বাড়িও ভালো লাগত না। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন স্কুলে যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু শুনলাম—বাবা বলে দিয়েছেন, স্কুলে যেতে হবে না। মাস্টার এসে আমাকে বাড়িতে পড়াবে। আমার স্কুলে যেতে না দেওয়ার কারণ আমি তখন যা অনুমান করেছি তা হচ্ছে—কোনো একদিন হয়তো স্কুল থেকে আমার মা আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

মিসির আলি বললেন, এখন আপনার অনুমান কী?

'আমি স্যার আমার অনুমানের কথা আপনাকে বলব না। আমি আমার অনুমানের কথা বলে আপনাকে প্রভাবিত করব না।'

'বেশ, আপনি বলতে থাকুন।'

আমার জীবন কাটতে লাগল বাড়ির পেছনে কুয়োতলায়। বাঁধানো কুয়োতলা আমি চক দিয়ে ছবি এঁকে ভরিয়ে ফেলতাম। সন্ধ্যাবেলা সর্দার চাচা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন—'ভালো হইছে। সৌন্দর্য হইছে।' তারপর কুয়ো থেকে বালতি বালতি পানি তুলে কুয়োতলা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন, যাতে পরদিন আমি ছবি আঁকতে পারি।

যে মাস্টার সাহেব আমাকে পড়াতে এলেন তাঁকে আমার পছন্দ হল। খুবই পছন্দ হল। হাসিখুশি। পড়াতেন খুব ভালো। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে গল্প করতেন।

মানুষটা খুব রোগা। অনেকখানি লম্বা। অতিরিক্ত লম্বার কারণেই বোধহয় কুঁজো হয়ে থাকতেন। চাইনিজদের মতো তাঁর থুতনিতে দাড়ি ছিল। প্রচুর সিগারেট খেতেন। সস্তা দামের সিগারেট। সিগারেটের কড়া গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত। বমি আসত। যখন গল্প শুরু করতেন তখন আর কিছু মনে থাকত না। তামাকের গন্ধও পেতাম না।

'কী গল্প করতেন?'

'নানান ধরনের গল্প। চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টের পুরো গল্পটা তিনি আমাকে বলেন, কাঁদতে কাঁদতে আমি এই গল্প শুনি। আজ পর্যন্ত আমি কাউকে এত সুন্দর গল্প বলতে শুনি নি।

অল্প কিছুদিন স্যার আমাকে পড়ালেন। তারপর তাঁর চাকরি চলে গেল।'

'কেন?'

'আপনাকে পরে বলব। ব্যাখ্যা করে বলব। স্যারের প্রসঙ্গ এখন থাক। যে কথা বলছিলাম—উনার চাকরি চলে গেলেও উনি কিন্তু প্রায়ই আসতেন। চুপিচুপি আসতেন, বেছে বেছে এমন সময় আসতেন যখন বাবা থাকতেন না। গলা নিচু করে বলতেন, তোমাকে দেখতে আসলাম। ভালো আছ? তোমার বাবা বাসায় নাই তো? আমি যদি বলতাম, না। তিনি অসম্ভব আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সিগারেট ধরাতেন।

একদিন ঠিক দুপুর বেলায় এসে গলা নিচু করে বললেন, তন্ময়, বাবা একটা কথা শোন—তোমার মা তোমাকে একটু দেখতে চায়। শুধু একপলক দেখবে। তোমার মা'র খুব শরীর খারাপ। হয়তো বাঁচবে না। তোমাকে খুব দেখার ইচ্ছা। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে? দুপুর বেলা তো তোমার বাবা বাসায় বেশিক্ষণ থাকেন না। তখন নিয়ে যাব। দেখা করিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। যাবে? এই দেখ, তোমার মা একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটা পড়।

আমি চিঠিটা না পড়েই তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, কাউকে কিছু বলবে না। কাউকে কিছু বললে তোমাকে নিতে দেবে না।

'আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'আমি তোমাকে নিতে আসব না—বুঝলে? তুমি করবে কি—দুপুর বেলায় সুযোগ বুঝে গেট দিয়ে বাইরে চলে আসবে। এক দৌড়ে সদর রাস্তায় চলে আসবে। একটা

বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে না—ঐখানে আমি থাকব। তুমি আসামাত্র তোমাকে নিয়ে চলে যাব। আসতে পারবে না?'

'পারব।'

'দেখো, কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। জানতে পারলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন না। উনি সেই মানুষই না। আমি একজন দরিদ্র মানুষ...।'

'আমি যাব।'

'কবে আসবে?'

'আপনি বলুন।'

'আগামীকাল পারবে?'

'হুঁ পারব।'

উনাকে খুব চিন্তিত মনে হলেও আমি মোটেই চিন্তিত হলাম না। আমার মনে হল—কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই আমি চলে আসব। তা ছাড়া শীতের দুপুরে সর্দার চাচা পাকা বারান্দায় পাটি পেতে রোদে ঘুমায়। বাবা বাসায় থাকেন না। তিনি ফেরেন সন্ধ্যায়। গেটে যে থাকে সেও ঝিমুতে থাকে। এক ফাঁকে ঘর থেকে চলে গেলেই হল।

তাই করলাম। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে মাস্টার সাহেব শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেট। তাঁকে দেখে দারুণ চিন্তিত মনে হল। ভীত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। আমাকে দেখে তাঁর উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল। তিনি বললেন, কেউ দেখে নি তো?

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, চল একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে নি।

উনি যখন বেবিট্যাক্সি দরদাম করছেন তখনই সর্দার চাচা উপস্থিত হলেন। আমাদের দুজনকেই বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাবা আসলেন সন্ধ্যাবেলা। তিনি আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু স্যারের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। সেই শাস্তি ভয়াবহ শাস্তি। একতলার দারোয়ানের ঘরে দরজা বন্ধ করে মার। সেই ঘরের ভেতর আমিও আছি। বাবা চাচ্ছিলেন যেন শাস্তির ব্যাপারটা আমিও দেখি।

স্যারকে মারছিল সর্দার চাচা। আমি একটা খাটের উপর দাঁড়িয়ে সেই ভয়ংকর দৃশ্য থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দেখছি। স্যার একসময় রক্তবমি করতে লাগলেন এবং একসময় কাতর গলায় বললেন, আমারে জানে মারবেন না। আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

সর্দার চাচা হিসহিস করে বললেন,—চুপ। শব্দ করলে কইলজা টান দিয়া বাইর কইরা ফেলামু। চুপ।

এরপর কী হল আমার মনে নেই। কারণ, আমার জ্ঞান ছিল না। আমি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে যাই। জ্ঞান হলে দেখি আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। সর্দার চাচা আমার মাথায় পানি ঢালছেন।

আমি বললাম, উনি কি মারা গেছেন?

For More Book Download Go To www.missabook.com

সর্দার চাচা বললেন, আরে দূর বোকা! মানুষ অত সহজে মরে না। মানুষ মারা বড়ই কঠিন। তারে রিকশায় তুল্যা বাসায় পাঠায়ে দিছি।

'রক্তবমি করছিল?'

'পেটে আলসার থাকলে অল্প মাইর দিলেই নাকে-মুখে রক্ত ছোটে। ও কিছু না।'

'উনি তা হলে মরেন নাই?

'না না। আইচ্ছা ঠিক আছে—তোমারে একদিন তাঁর বাসায় নিয়া যাব নে।'

'আমি উনার বাসায় যাব না।'

'এইটাই ভালো। কী দরকার?'

সর্দার চাচা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। স্যারকে ঐরাতে ভয়ংকরভাবে মারা হয়েছিল। অচেতন অবস্থায় তাঁকে গভীর রাতে বাহাদুর শাহ্ পার্কে ফেলে আসা হয়। সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু হয় হাসপাতালে। মৃত্যুর আগে তাঁর জ্ঞান ফেরে নি। কাজেই তিনি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলে যেতে পারেন নি।

মুশফেকুর রহমান চুপ করল। হাই তুলতে তুলতে বলল, আজ এই পর্যন্ত থাক। ঠাণ্ডা বেশি লাগছে। মিসির আলি বললেন, আপনার স্যারের নাম কী?

'উনার নাম জানি না। খুব অল্পদিন পড়িয়েছিলেন। নাম জানা হয় নি। উনি ছিলেন একজন পেশাদার প্রাইভেট টিউটর। ছাত্র পড়ানো ছাড়া আর কিছু করতেন না।'

'উনি আপনাকে কতদিন পড়িয়েছিলেন?'

'সপ্তাহ দুই। কিংবা তার চেয়েও কম। আমার শৈশবের ঘটনা আপনার কাছে কেমন লাগল?'

'মোটামুটি লেগেছে। সাজানো গল্প। যত সুন্দরই হোক সাজানো গল্প ভালো লাগে না।'

মুশফেকুর রহমান তীক্ষ্ণ গলায় বলল, সাজানো বলছেন কেন?

'গল্পটা সাজানো মনে করার পেছনে আমার অনেকগুলো কারণ মনে আসছে। যে ভদ্রলোক মাত্র দু সপ্তাহ আপনাকে পড়িয়েছেন তিনি এই সময়ের ভেতর আপনাকে গোপনে নিয়ে আপনার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে আনার মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনা হাতে নেবেন তা বিশ্বাস্য নয়। আমার মনে হয়, ঘটনাটা এরকম—আপনি বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলেন। যখন আপনার সর্দার চাচা আপনাকে ধরল তখন শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাস্টার সাহেবকে জড়িয়ে গল্পটা তৈরি করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় হয়তো মাস্টার সাহেব সামনে পড়ে গেছেন। যে কারণে আপনাকে আপনার বাবা কোনো শাস্তি দেন নি। আপনার সর্দার চাচা ঐ নিরীহ মানুষটিকে এমন ভয়ংকর শাস্তি কেন দিল তাও পরিষ্কার হচ্ছে না। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত একটি শিশুকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। আর অপরাধ ধরা হলেও মৃত্যুদণ্ড তার শাস্তি হতে পারে না।

মুশফেকুর রহমান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমার গল্প আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না?

'না। কারণ গল্পে ফাঁক আছে।'

'সুদূর শৈশবের গল্প বলছি। ফাঁক থাকাই তো স্বাভাবিক।'

'ফাঁকগুলো অনেক বড়।'

মুশফেকুর রহমান বলল, 'স্যার, শুরুতেই আপনি আমাকে একজন ভয়ংকর মানুষ ধরে নিয়েছেন। আমার কারণেই তা করেছেন। আমি নিজেকে ভয়ংকর মানুষ হিসেবেই আপনার সামনে উপস্থিত করেছি। যে কারণে অতি সামান্য অসামঞ্জস্যও আপনার কাছে অনেক বড় লাগছে। গল্পে ফাঁক আছে বলে যে দাবি আপনি করছেন, আমি সেই ফাঁক ঠিক ধরতে পারছি না। আমি শুধু বলছি যে—যা ঘটেছে তা আপনাকে আমি বলার চেষ্টা করেছি। স্যার, আপনি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। আপনাকে মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন আমার নেই।'

মিসির আলি বললেন, 'আমাকে সত্য বলারও তো প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে। সব ঘটনা আপনাকে ঠিকঠাকমতো জানানো দরকার।'

'আপনি ঠিকঠাকমতো বলছেন না। কী করে আপনি জানলেন যে মাস্টার সাহেবকে মেরে বাহাদুর শাহ্ পার্কে ফেলে আসা হয়? যদি ফেলেও আসে আপনাকে কেউ সেই তথ্য দেবে না। ক্লাস ফোরে যে ছেলেটি উঠেছে সে পরদিন খবরের কাগজ পড়ে এই তথ্য উদ্ধার করবে তা বিশ্বাস্য নয়। মাস্টার যে মারা গেছে এটিও আপনার জানার কথা না। আপনার সর্দার চাচা কি আপনার কাছে স্বীকার করেছিলেন?'

'না স্বীকার করেন নি। তবে পরদিন খুব ভীত ভঙ্গিতে আমাকে বলেছিলেন—বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে। পুলিশ এলে আমি যেন বলি—আমি এই মাস্টারকে চিনি না।'

'পুলিশ কি এসেছিল?'

'জি এসেছিল, তবে আমার সঙ্গে পুলিশের কোনো কথা হয় নি। বাবার সঙ্গে কথা বলে তারা খুব খুশি মনে চলে যায়।'

'মাস্টার সাহেব যে বাহাদুর শাহ্ পার্কে পড়েছিলেন এই তথ্য কোথায় পেলেন?'

মুশফেকুর রহমান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হল কথাটা বলবেন কি বলবেন না তা ঠিক করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন—

'এই তথ্য আমি মাস্টার সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি।'

'তার মানে?'

'যে মাস্টার সাহেবের কথা আপনাকে বললাম, উনি তাঁর মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে বাস করছেন।'

'কী বললেন?'

'ঐ মৃত ব্যক্তি গত একুশ বছর ধরে আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের বাড়িতে বাস করেন। আমি জানি ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। হাস্যকর। এটা যে বিংশ শতাব্দী তাও আমি জানি। মানুষ চাঁদে নেমেছে, চাঁদের মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ আছে এটি যেমন সত্যি—আমার স্যার আমাদের বাড়িতে বাস করছেন এটিও তেমনি সত্য। আমি চাই আমার ঐ স্যারের সঙ্গে আপনার দেখা হোক, কথা হোক। তিনি আপনার মতোই বুদ্ধিমান। কিংবা কে জানে আপনার চেয়েও হয়তো বুদ্ধিমান। তাঁকে আপনার পছন্দ হবে।'

'উনি আমাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ চেনেন। আমি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তা তিনি জানেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।'

'যে দুজন খুন হয়েছে, তারা কারা?'

'একজন সর্দার চাচা। অন্যজন আমার বাবা।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। মুশফেকুর রহমান বলল, আপনি কি আমার স্যারের সঙ্গে কথা বলবেন?

'না।'

'না কেন?'

একজন এসে আমাকে বলবে—তার বাড়িতে একটি প্রেতাত্মা বাস করছে, সেই প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়—আর ওমনি আমি কথা বলার জন্যে রওনা হব—তা হয় না। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ, মানসিকভাবে অসুস্থ নই।'

'আপনি কি কোনো কৌতূহল বোধ করছেন না?'

'প্রেতাত্মা বিষয়ে কোনো কৌতূহল বোধ করছি না। তবে আপনার ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি খুবই অসুস্থ একজন মানুষ। আপনার মার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। উনি কি জীবিত আছেন?'

'জি, জীবিত আছেন। আমি জানতাম আপনি আমার মার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। আমি উনার ঠিকানা লিখে এনেছি। এই কাগজে লেখা আছে।'

মিসির আলি যন্ত্রের মতো ঠিকানা লেখা কাগজ হাতে নিলেন।

৪

ভদ্রমহিলার নাম মোমেনা খাতুন।

১৮/২ তল্লাবাগে তাঁর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। মিসির আলি অনেকবার টেলিফোন করলেন। রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না। সেট হয়তো নষ্ট হয়ে আছে। নম্বর খুঁজে বাড়ি বের করার কাজটা তিনি একেবারেই পারেন না। তিনি জানেন তল্লাবাগে উপস্থিত হয়ে যদি বলেন, ১৮/২ বাড়িটা কোথায়, তা হলেও কোনো লাভ হবে না। যাকে জিজ্ঞেস করা হবে সে এমনভাবে তাকাবে যে এই নাম্বার শুনে সে বড়ই চমৎকৃত বোধ করছে। এমন অদ্ভুত নাম্বার কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারছে না। আরেক দল আছে যারা নাম্বার শুনে বলবে—ও আচ্ছা, আঠার বাই দুই। নাক বরাবর যান, তারপর লেফটে যাবেন। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে। এরা সবজান্তার কাজটা করে কিছু না জেনে। অন্যকে বোকা বানিয়ে আনন্দ পেতে চায়।

এলাকার বাড়িঘরের নম্বর সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। যারা থ্রি-ফোরে পড়ে। মানুষের মতো বাড়ির নাম্বার আছে—এই বিষয়টি তাদের হয়তো আলোড়িত করে। তারা মনে রাখার চেষ্টা করে। বাড়ির নাম্বার নিয়ে বিব্রত মানুষকে সত্যিকার অর্থেই এরা সাহায্য করতে চায়।

এদের একজনের সাহায্য নিয়েই মিসির আলি ১৮/২ তল্লাবাগ খুঁজে বের করলেন। সরু রাস্তার উপর বিরাট বাড়ি। বাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে সবই বড় বড়। ড্রয়িংরুমে বিশাল আকৃতির সোফা। দেয়ালে কাবা শরিফের প্রকাণ্ড বাঁধাই ছবি। একটি টিভি আছে—একে কত ইঞ্চি টিভি বলে কে জানে। সিনেমার পর্দার মতো বড় স্ক্রিন। শুধু বাড়ির দরজা-

জানালা ছোট ছোট। প্রথম দর্শনেই মিসির আলির মনে হল—সোফা, টিভি এগুলো এ বাড়িতে ঢোকাল কীভাবে?

ড্রয়িংরুমে বেশকিছু লোক। গাদাগাদি করে সোফায় বসে আছে। বাড়িতে কোনো উৎসব হয়তো। সবাই সেজেগুজে আছে। অল্পবয়সী বালিকারাও ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে গালে রোজ মেখে সেজেছে। সবাইকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

মিসির আলির মনে হল মোমেনা খাতুন নামের এই বৃদ্ধা মহিলার প্রতি কারো কোনো কৌতূহল নেই। আগ্রহও নেই। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনেও কেউ কোনো গা করছে না। মধ্যবয়স্ক এক লোক বিরস মুখে বললেন, বসুন দেখছি।

বলেই তিনি কর্ডলেস টেলিফোনে কাকে যেন ধমকাতে লাগলেন। লোকটার পরনে হালকা কমলা রঙের স্যুট। গলায় ছোট ছোট ফুল আঁকা টাই—তবে তাঁর প্যান্টের জিপার খোলা। সবাই তা দেখছে, কেউ কিছু বলছে না। মনে হয় বলার সাহস পাচ্ছে না।

মিসির আলি সোফায় বসে রইলেন একা একা। আঠার-উনিশ বছরের একটা মেয়ে ঝড়ের গতিতে বসার ঘরে ঢুকে মিসির আলিকে বলল—আপনি কি কার রেন্টাল থেকে এসেছেন? এত দেরি যে? বলেই জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেল। উঁচু গলায় বলল, বাস চলে এসেছে মা।

বোঝা যাচ্ছে এরা দল বেঁধে কোথাও যাচ্ছে। পিকনিক হবার সম্ভাবনা। শীতকালের শুক্রবারে পিকনিক লেগেই থাকে। পিকনিক হলে মোমেনা খাতুনের দলটির সঙ্গে যাবার কথা। ইচ্ছা না থাকলেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পিকনিকে নিয়ে যেতে হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও জীবনের শেষ দিকে এসে পিকনিক জাতীয় ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন।

টেলিফোন হাতে ভদ্রলোক কথা বলেই যাচ্ছেন, বলেই যাচ্ছেন এবং একটি কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছুক্ষণ পরপর বলছেন। একসময় লাইন কেটে গেল কিংবা ওপাশের ভদ্রলোক লাইন ছেড়ে দিলেন। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে টেলিফোন সেটটার দিকে তাকাচ্ছেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। মিসির আলি আবার বললেন, আমি একটু মোমেনা খাতুনের সঙ্গে কথা বলব।

'আপনাকে অপেক্ষা করতে বললাম না। ব্যস্ততাটা তো দেখতে পাচ্ছেন? নাকি পাচ্ছেন না। সবাই গায়ে-হলুদে যাচ্ছে।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনার প্যান্টের জিপার খোলা।'

ভদ্রলোক এমনভাবে মিসির আলির দিকে তাকালেন যেন মিসির আলি নিজেই জিপার খুলেছেন। মিসির আলি বললেন, উনি আছেন তো?

'হ্যাঁ, আছেন। কিছুক্ষণ ওয়েট করুন। ভিড় কমুক, তারপর আপনাকে আন্টির কাছে নিয়ে যাব। জাস্ট দেখা দিয়ে চলে যাবেন। বেশিক্ষণ বিরক্ত করবেন না। কথা বলা পুরোপুরি নিষেধ। আন্টির আবার বেশি কথা বলার অভ্যাস। কথা বলে বলে রোগ বাড়াচ্ছেন।'

বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা অসুস্থ। সম্ভবত হাসপাতালে ছিলেন। সম্পতি বাসায় আনা হয়েছে। অনেকেই তাঁকে দেখতে আসছে বলেই মিসির আলিকে এ বাড়ির সবাই স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর একজন কাজের মেয়ে এসে বলল, ভিতরে আসেন, জুতা খুইল্যা আসেন।

লম্বা বারান্দা পার হয়ে মিসির আলি ছোট একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের দরজা–জানালা বন্ধ। মেঝে মনে হয় ডেটল দিয়ে ধুয়েছে। ঘরময় ডেটলের গন্ধ। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে খাট পাতা। মিসির আলি ভেবেছিলেন বৃদ্ধা এক মহিলাকে শুয়ে থাকতে দেখবেন। তা দেখলেন না। মোমেনা খাতুন একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখে চশমা। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। গায়ের কাপড়টিও সাদা, মাথার চুল সাদা। যে বিছানায় বসেছেন সেই বিছানার চাদরটাও সাদা। সব মিলে সুন্দর একটি ছবি।

মিসির আলি বললেন, আপনি কেমন আছেন?

ভদ্রমহিলা স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, জি ভালো।

ভদ্রমহিলার কান ঠিক আছে। কথাও জড়ানো হয়, তবে চোখের দৃষ্টির সম্ভবত কিছু সমস্যা আছে। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে।

'আপনি অসুস্থ জানতাম না। অসুস্থ জানলে আসতাম না।'

'আমি ভালো আছি। বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বলল, কিছু হয় নাই।'

'আমি খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলব—যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আমার পরিচয় আপনাকে দেওয়া দরকার। আমার নাম মিসির আলি। আমি...'

'আপনার পরিচয় দিতে হবে না। আমার ছেলে তার ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিল, সে বলেছে আপনি আসবেন।'

'আপনার ছেলে আপনাকে দেখতে আসে নি।'

'না, আসে না। এর আগে একবার জরায়ুর টিউমার অপারেশন হয়েছিল—তিন মাস ছিলাম হাসপাতালে। খবর পেয়েও দেখতে এল না। মরেও যেতে পারতাম। আমি তো তার মা। বলুন আপনি—আমি তার মা না?'

'অবশ্যই আপনি মা? বেশি কথা বলা বোধহয় আপনার নিষেধ। আমি বরং এক কাজ করি—এমনভাবে প্রশ্ন করি যেন হ্যাঁ–না বলে জবাব দেওয়া যায়।'

'কথা বলা নিষেধ—এটা আপনাকে কে বলল? কোনো নিষেধ না। ডাক্তার এমন কিছু বলে নাই। এইসব কথা এই বাড়ির লোকজন বানিয়েছে—। যেই আসে তাকে বলে—কথা বলা নিষেধ। যাক, বাদ দিন। কী যেন বলছিলাম—'

'আপনি বলছিলেন—আগে একবার আপনার জরায়ুর টিউমার অপারেশন হয়েছিল—তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন। আপনার ছেলে খবর পেয়েও আপনাকে দেখতে আসে নি। আপনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন—আপনি তার মা কিনা।'

মোমেনা খাতুন মিসির আলির কথায় হৃষ্টচিত্তে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি তো তার মা। সন্তান পেটে ধরেছি। সেই আমাকে আমার স্বামী বাড়ি থেকে বের করে দিল। সন্ধ্যারাত্রিতে আমাকে এসে বলল—মোমেনা, বাইরে রিকশা আছে। যাও, রিকশায় ওঠ। তার রাগ বেশি। ভয়ে কিছু জিজ্ঞাস করলাম না। সেই যে রিকশায় উঠলাম—উঠলামই। ঐ বাড়িতে আর ঢুকতে পারলাম না। এখন আমি পড়ে আছি আমার ভাইয়ের বাড়িতে। আমি তো থাকতে পারতাম আমার ছেলের সঙ্গে। পারতাম না?'

'জি পারতেন।'

'তার উচিত ছিল না আমাকে তার বাড়িতে রাখা? আমি তার মা। আমি কেন অন্যের বাড়িতে থাকব?'

'জি তা তো বটেই। তন্ময়ের বাবার মৃত্যুর পর আপনি ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠলেন না কেন?'

'কেমন করে উঠব! তখন আমার ভাইয়া জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে। লোকটা রেলে চাকরি করত। ছোট চাকরি। তবে মানুষ খারাপ ছিল না। সে মারা গেছে কাঁকড়া বিছার কামড়ে। কাঁকড়া বিছার কামড়ে মানুষ মারা যায় এমন কথা আগে কখনো শুনেছেন? শুনেন নাই। এটা হল আমার কপাল—। লোকটা রেলের গুদামঘরে ঢুকেছে। টিন না কী যেন সরাচ্ছে—এমন সময় হাতে কামড় দিল। চিৎকার দিয়ে উঠল, সাপ সাপ। সে ভেবেছিল সাপ। লোকজন দৌড়ে এসে দেখে কাঁকড়া বিছা। কেউ কোনো গুরুত্ব দিল না। কামড়ের জায়গায় চুন মাখিয়ে দিল। রাতে লোকটার জ্বর আসল। খুব জ্বর। আমাকে ডেকে তুলে বলল, মোমেনা, বড় পানির পিয়াস লেগেছে। পানি দাও। আমি বাতি জ্বালিয়ে দেখি—হাত ফুলে ঢোল হয়েছে। গা আগুনের মতো গরম। আমি বললাম, ডাক্তার ডাকি। সে বলল, ভোর হোক। এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাবে? সেই ভোর আর তার দেখা হল না।'

মিসির আলি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ভদ্রমহিলা কথা বলেই যাচ্ছেন। মৃত্যুর বর্ণনা। মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা। কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। একবার কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই মিসির আলি বললেন, আপনার ঐ পক্ষের কোনো ছেলেমেয়ে নেই?

'থাকবে না কেন, আছে। দুই মেয়ে। একজনকে মেট্রিক পাসের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। ও এখন আছে কুমিল্লায়। আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিল। একা এসেছিল, জামাই আসতে পারে নি। ছুটি পায় নি। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে গত বৎসর। নানান কাণ্ড করে মেয়ে নিজেই বিয়ে করল। ভদ্র সমাজে তা বলা যায় না। বড়ই লজ্জার ব্যাপার। অথচ এই মেয়েটাই ভালো ছিল। খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। রাতে একা ঘুমাতে পারত না।...

ভদ্রমহিলা ছোট মেয়ের ঘটনাও পুরোটা বর্ণনা করলেন। দাঁড়ি কমা কিছুই বাদ দিলেন না। মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে তন্ময় সম্পর্কে বলুন। আপনার কাছে ওর কথাই শুনতে এসেছি।

'ওর কথা আমি কী বলব? ওকে কি আমি দেখেছি? শুধু পেটেই ধরেছি। ও যখন কথা বলা শিখল তখন তার বাবা আমাকে দূর করে দিল। সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে এসে বলল, মোমেনা, রিকশায় ওঠ—'

'রিকশায় ওঠার ব্যাপারটা আপনি আগে একবার বলেছেন।'

'একবার বললে আবারো বলা যায়। দুঃখের কথা বারবার বললে দুঃখ কমে। সুখের কথা বারবার বললে সুখ বাড়ে। এই জন্যে দুঃখের কথা, সুখের কথা দুটাই বারবার বলতে হয়।'

'আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন কেন?'

' সেটা আমি আপনাকে বলব না। সেটা লজ্জার ইতিহাস। আপনি অনুমানে বুঝে নেন। লোকটা পাগল ধরনের ছিল। ছেলেও হয়েছে বাপের মতো। বাপ যদি হয় ছয় আনা, ছেলে হয়েছে দশ আনা।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'কেন বলব না? একশ বার বলব। আমার ছেলের মুখের উপর বলব। অবস্থা বিবেচনা করেন। অবস্থা বিবেচনা করলে আপনেও বলবেন—তন্ময়ের তখন বাবা মারা গেছে। সে বলতে গেলে দুধের শিশু। আমার বিবাহ হয়েছে। আমি চলে গেছি জামালপুর। এই অবস্থায় তন্ময়কে মানুষ করেছে তাদের ম্যানেজার। নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে। তার সঙ্গে আমার ছেলে কী ব্যবহারটাই করল! সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমাকে যেমন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের করে দিল—তাদেরকেও বের করে দিল। ম্যানেজার, আর তার মেয়ে। মেয়েটা বি.এ. পড়ে। কী সুন্দর পরীর মতো মেয়ে।'

'ঐ মেয়েকে আপনি দেখেছেন?'

জিনা দেখি নি। লোকমুখে শোনা। আমার সবই লোকমুখে শোনা।

'উনারা কি আপনার ছেলের বাড়িতে থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বের করে দিলেন কিছু জানেন?'

'কিছুই জানি না। ছেলে শুধু বলেছে—সে এখন থেকে একা থাকতে চায়। মানুষ তার ভালো লাগে না। কয়েকটা কুকুর নাকি পুষেছে। কুকুর নিয়ে থাকে।'

'ম্যানেজার সাহেব এখন কোথায় থাকেন?'

'জানি না কোথায় থাকেন। তবে চাকরি করেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

'আপনার ছেলে এখন ঐ বাড়িতে একাই থাকে?'

'কিছুক্ষণ আগে কী বললাম—কতগুলো কুকুর পালে। আগে দারোয়ান ছিল। কাজের লোক ছিল। একে একে সবাই চলে গেছে। এখন শুনি—একলাই থাকে।'

'চাকরি ছেড়ে চলে গেছে কেন?'

'জানি না কেন। সম্ভবত কুকুরের ভয়ে। দৈত্যের মতো একেকটা কুকুর। এখন আপনি বলেন—জীবন বড়, না চাকরি বড়?'

'আপনার স্বামী কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?'

'একটু আগে তো বলেছি—কাঁকড়া বিছার কামড়ে মারা গেছে। রেলের গুদামে ঢুকেছে...'

'আপনার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'অপঘাতে মৃত্যু। দোতলার সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে মরে গেল। সিঁড়ি থেকে পড়ে কেউ মরে? আপনি বলেন। হাত-পা ভাঙে—কিন্তু মরবে কেন?'

মিসির আলির মনে হল ইনাকে কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। অসুখবিসুখ, দুঃখকষ্ট এই মহিলাকে পর্যুদস্ত করেছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত হতাশার কথাই বলবেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা নিজেকে নিয়েই। ইনি কথা বলতে পছন্দ করেন। যারা কথা বলতে পছন্দ করে তারা অধিকাংশ সময়ই অর্থহীন কথা বলে। কথা বলে আরাম পায় বলেই কথা

বলা। সেসব কথার অধিকাংশই হয় বানানো। মিসির আলি যা জানতে চান তা ইনি হয়তো বলতে পারবেন না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—

'আপনার ছেলের অসুখের কথা কি মনে আছে? ছোটবেলায় অসুখ হয়ে গেল?'

'কেন মনে থাকবে না। মনে আছে। কালাজ্বর হয়েছিল। এখন আপনি বলুন—আপনি কি শুনেছেন কারো কালাজ্বর হয়? শুনেন নি। কারণ কারোর হয় না। এটা হল আমার কপাল—যে জিনিস কারোর হবে না—আমার কপালে সেটা থাকবে। কালাজ্বরে ব্রহ্মচারী ইনজেকশন দিতে হয়। সেই ইনজেকশন পাওয়া যায় না। উল্টাপাল্টা চিকিৎসা। সেই চিকিৎসায় কী হল দেখেন। জিহ্বা কালো হয়ে গেল। দেখলে ভয় লাগে। তন্ময় যে কারো সঙ্গে মেশে না, কারো সঙ্গে কথা বলে না—এই জন্যেই বলে না। একা একা থাকে। আপনাকে বলে রাখলাম, সে বিয়েও করতে পারবে না। কে বিয়ে করবে এই ছেলেকে? একবার হাঁ করলে মেয়ে দৌড়ে পালাবে। আমি হলাম মা। আমিই ভয় পেতাম। মুখের দিকে তাকাতাম না। এই বার তার ম্যানেজারকে আমি বলেছি—তোমার সাহেবকে বল কত নতুন নতুন চিকিৎসা বের হয়েছে, এই রোগের চিকিৎসকও আছে। তোমার সাহেবের তো টাকাপয়সা আছে। বিলাত ও আমেরিকা গিয়ে চিকিৎসা যেন করে।'

'উনার কি অনেক টাকাপয়সা?'

'একসময় ছিল। এখন নাই। তার বাবার টাকাপয়সা ছিল। নানান ব্যবসাপাতি ছিল। টঙ্গীতে চামড়ার কারখানা ছিল। নারায়ণগঞ্জে ছিল সুতার মিল। শেষে মতিভ্রমও হল। সব বিক্রি করে দিল। তন্ময়ের কিছুই নাই। কারখানা সব বিক্রি করে দিয়েছে। ওয়ারীতে একটা দোতলা বাড়ি আছে। বাড়িটার ভাড়া পায়। এখন শুনছি সেই বাড়িও বিক্রি করে দেবে।'

'কোথায় শুনলেন? সে বলেছে?'

'না, সে বলে নাই। এইসব কথা সে বলে না। লোকমুখে শুনি।'

'তন্ময় কি আপনাকে হাতখরচের টাকা দেয়?'

'তা দেয়। মাসের প্রথমে, এক-দুই তারিখে ওর নতুন ম্যানেজার টাকা নিয়ে আসে। ম্যানেজারের নাম রশিদ মোল্লা। আমার হাতে দিয়ে বলে—আম্মা, এই কাগজটায় সই করে টাকা গুনে রাখেন। আমি বলি, বাবা, সই করার দরকার কী? সে বলে দরকার আছে, আম্মা, সই করেন। ম্যানেজার আমাকে খুব সম্মান করে। আম্মা ডাকে।'

'রশিদ মোল্লার কাছ থেকেই কি শুনেছেন যে ওয়ারীর বাড়ি বিক্রি হচ্ছে?'

'জি।'

'উনি কোথায় থাকেন? আপনার ছেলের সঙ্গে?'

'না না। কী বললাম আপনাকে? তন্ময় তার বাড়িতে কাউকে রাখে না। সে থাকে, দুইটা দারোয়ান থাকে আর বাড়িভর্তি কুকুর। আমি তাকে বললাম, বাবা, এত কুকুর কেন? কুকুর প্রাণীটা ভালো না। তুমি বিড়াল পোষ। বিড়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখতেও সুন্দর। আমাদের নবীজীও বিড়াল পছন্দ করতেন। তা সে আমার কথা শুনে না। কেন শুনবে? আমি কে? কুকুরগুলো সারা রাত বাড়ির চারদিকে ছোটাছুটি করে। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ডাকে। বড়ই ভয়ংকর।'

'ভয়ংকর কী করে বলছেন? আপনি তো ঐ বাড়িতে যানও নি। কুকুরের ডাকও শুনেন নি।'

'রশিদের কাছে শুনলাম। প্রতি মাসে আসে। গল্পটল্প করে। যাবার সময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ম্যানেজার বলল, আম্মা, বড় ভয়ংকর অবস্থা। নয়টা কুকুর। সারা রাত বাড়ির চারদিকে ঘুরে। ভয়ংকর স্বরে একসঙ্গে ডাকে। গায়ের রক্ত পানি হয়ে যায়।'

'রশিদ সাহেব কোথায় থাকেন, আপনি ঠিকানা জানেন?'

'কাগজে লেখা আছে। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। সে আমাকে বলল, দরকারে-অদরকারে ডাকবেন। আমি চলে আসব। যত রাতই হোক, খবর পেলে চলে আসব। পরের ছেলে এই কথা বলে কিন্তু নিজের ছেলে কিছু বলে না। খোঁজও নেয় না। এই ছেলে দিনের বেলা ঘর থেকে বের হয় না। সে ঘর থেকে বের হয় সন্ধ্যার পর।'

মিসির আলি ম্যানেজারের ঠিকানা নিলেন। উঠবার সময় বললেন, আমি যে আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছি—কেন করছি জানতে চান না?

'না। জেনে কী হবে? তার উপর তন্ময় খবর দিয়েছে—আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক আসবেন। তাঁর নাম মিসির আলি। উনি আপনাকে অনেক প্রশ্ন করবেন। সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। কোনো কিছুই গোপন করবেন না। যা আপনি জানেন তাই শুধু বলবেন। যা জানেন না তা বলবেন না। নিজে অনুমান করে যদি কিছু বলেন তা হলে সেটাও উনাকে জানাবেন। বলবেন—এটা আমার অনুমান।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। আজ তা হলে উঠি?'

'আপনি কি আবার আসবেন?'

'জি না। আর আসব না।'

'আপনাকে চা পানি কিছুই দিতে পারলাম না। ঘরে অবিশ্যি লোক আছে। থাকলে কী হবে—এদের কিছু বললে বিরক্ত হয়। সেদিন জইতরীর মাকে বললাম—পিয়াস লাগছে, লেবু দিয়ে একগ্লাস শরবত দাও। জইতরীর মা বলল, পারব না। চুলা বন্ধ। দেখেন অবস্থা। শরবত বানাতে চুলা লাগে? আরেকদিন কী হয়েছে শুনেন—'

'আজ যাই। আমার একটা কাজ ছিল।'

'একটু বসেন না। কথা বলার লোক পাই না। কাউকে যে সুখ-দুঃখের একটা কথা বলব সে উপায় নাই। নিজের ভাইয়ের বাসা, এরা এমন ভাব করে যেন আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে। অথচ নগদ পয়সা দিয়ে থাকি। মাসের প্রথমে গুনে গুনে দুই হাজার টাকা দেই। আমার পিছনে কি দুই হাজার টাকা খরচ হয়—আপনিই বলেন? কী খাই আমি? দুই বেলায় এক পোয়া চালের ভাতও খাই না। মাসে সাত সের চালের ভাতও খাই না। সাত সের চালের দাম কত? ধরেন নব্বুই। মাছ তরকারি ধরেন তিন শ—বেশিই ধরলাম। এত খাই না। রাতে এক কাপ দুধ খাই। দুধের দাম কত ধরবেন? এক শ ধরেন। এখন পনের টাকা লিটার। তা হলে কত হল? চার শ। আচ্ছা পাঁচশই ধরলাম। ঘরটার ভাড়া ধরলাম পাঁচ শ। হল এক হাজার। তারপরেও বাড়তি দেই এক হাজার। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। ভদ্রমহিলা গলা নিচু করে বললেন, তন্ময় আমাকে মাসে পাঁচ হাজার দেয়। ওরা সেটা জানে না। জানলে উপায় আছে? ওরা জানে মাসে দুই হাজার

পাই—সবটাই ওদের দিয়ে দেই। তবে আমার ভাইয়ের বউ সন্দেহ করে। আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন আমার ট্রাংকের তালা খুলে দেখেছে। অতি খারাপ মেয়েছেলে। মুখে মধু। হাসি ছাড়া কথা বলে না।

'আজ উঠি?'

'আহা বসেন না। একটু বসেন।'

মিসির আলি আরো এক ঘণ্টা বসলেন। বের হয়ে এলেন প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে।

ঘর থেকে বেরুবার পর মনে পড়ল একটি জরুরি কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি। উনি কি মাস্টার সাহেবকে দিয়ে কোনো চিঠি পাঠিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। কারণ জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। ভদ্রমহিলা বলবেন না। তিনি কিছু গোপন জিনিস জানেন। এগুলো আড়াল করবার জন্যেই এত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন। এত দীর্ঘ সময় কথা বলে একটি মাত্র জিনিস জানা গেল—নিজের ছেলে প্রসঙ্গে ভদ্রমহিলার কোনো আগ্রহ নেই।

তার চেয়ে বরং রশিদ মোল্লার কাছে যাওয়া যাক।

৫

রশিদ মোল্লার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

মোটাসোটা মানুষ। শরীরের তুলনায় মাথা ছোট। ধূর্ত চোখ। চোখ দেখেই মনে হয়—পৃথিবীর কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না। সম্ভবত নিজেকেও করেন না। কলিংবেল টেপার পর ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুলে দিলেন। তবে হাত দিয়ে দরজা ধরে থাকলেন। মনে হচ্ছে তিনি চান না ঘরে কেউ ঢুকুক।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি রশিদ মোল্লা?

'জি।'

'একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

'বলুন।'

'দরজায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না। বসতে হবে। মিনিট দশেক সময় আমি নেব।'

'এখন আমি নাতনিকে পড়াচ্ছি। ওর এস.এস.সি পরীক্ষা।'

'আমি না হয় অপেক্ষা করি। নাতনির পড়া শেষ করে আসুন।'

রশিদ মোল্লা বিরস মুখে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। বসার ঘর ছোট হলেও সুন্দর করে সাজানো। সবচেয়ে যা আশ্চর্যের ব্যাপার তা হচ্ছে—ফুলদানি ভর্তি টাটকা গোলাপ। মনে হচ্ছে এইমাত্র গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে।

রশিদ মোল্লা বিরক্ত গলায় বললেন, কী বলবেন বলুন। আপনার নাম কী? কোত্থেকে এসেছেন?

'আমার নাম মিসির আলি।'

রশিদ মোল্লা চমকাল না। এই নাম আগে শুনেছে তেমন কোনো লক্ষণও দেখাল না। অথচ তাঁর নাম এই লোক শুনেছে। তাঁর খবর দিয়ে এসেছে মুশফেকুর রহমানের মার কাছে।

রশিদ মোল্লা কঠিন গলায় বলল, আমার কাছে কী ব্যাপার?

'কয়েকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম। ইচ্ছা হলে জবাব দেবেন। ইচ্ছা না হলে জবাব দেবেন না।'

'আপনি কে, কেন প্রশ্ন করছেন তা তো বলবেন! আপনি কি পুলিশের লোক?'

'জি না।'

'প্রশ্নটা কী?

'মুশফেকুর রহমানের ম্যানেজার হিসেবে আপনি কতদিন ধরে কাজ করছেন?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার কী?'

'আমার জানা দরকার।'

'আপনার দরকার কেন?'

'আমি একটা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছি।'

'কী বিষয়?'

'মুশফেকুর রহমান প্রতি মাসে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন তাঁর মাকে দেওয়ার জন্যে। তাঁর মা দু হাজার টাকা রাখেন। আমার ধারণা—বাকি তিন হাজার টাকা তিনি জমা রাখেন আপনার কাছে। বছরে হয় ছয়ত্রিশ হাজার টাকা। দশ বছরে হবে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা। আপনি কতদিন ধরে টাকা দিচ্ছেন?'

'আপনাকে কে পাঠিয়েছে?'

'কেউ পাঠায় নি। নিজেই এসেছি। আমি যে আপনার কাছে একেবারেই অপরিচিত, তাও কিন্তু না। আপনার স্যার নিশ্চয়ই আমার কথা আপনাকে বলেছেন। কতদিন ধরে আপনি টাকা দিচ্ছেন?'

'আমার মনে নাই।'

'আপনি তো রসিদ রাখেন। পুরোনো রসিদ কি আপনার কাছে আছে, নাকি অফিসে জমা দিয়েছেন।?'

রশিদ মোল্লা ক্লান্ত গলায় বললেন, স্যার, আপনি বসুন।

মিসির আলি বসলেন। রশিদ মোল্লা বললেন, 'চায়ের কথা বলে আসি। আপনি চা খান তো?'

'খাই।'

ভদ্রলোক চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে বসলেন। তাঁর চোখে ভীত ভাব। মনে হচ্ছে অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। এতটা ভয় পাবার কারণও মিসির আলির কাছে স্পষ্ট নয়।

'রশিদ সাহেব!'

'জি।'

'ঐ মহিলার কত টাকা আপনার কাছে আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি অন্য কিছু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। যা জানতে চাই দয়া করে বলবেন। মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না। কারণ...থাক, কারণটা এখন আপনাকে না বললেও চলবে।'

‘কী জানতে চান, স্যার?’

‘মুশফেকুর রহমান সাহেব সম্পর্কে বলুন।’

‘কী বলব?’

‘যা জানেন বলুন। উনি লোক কেমন?’

‘খুবই ভালো লোক। এটা আমার একার কথা না—যাকে ইচ্ছা আপনি জিজ্ঞেস করুন। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে। উনার জিহ্বার একটা সমস্যা আছে। তাঁকে নিয়ে এই জন্যে লোকজন নানা আজেবাজে কথা ছড়ায়।’

‘কী ধরনের আজেবাজে কথা?’

‘ যেমন ধরেন উনার মাথা খারাপ—এইসব আর কি?’

‘আপনার ধারণা উনার মাথা ঠিক আছে?’

‘অবশ্যই ঠিক আছে।’

‘আমি তো শুনেছি—উনি বিরাট এক বাড়িতে একা থাকেন।’

‘একা থাকলেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায় না, স্যার। বিয়ের আগে আমিও একা থাকতাম।’

‘উনি শুধু যে একা থাকেন তাই না, নটা ভয়ংকর কুকুর পোষেন। এটা কি ঠিক?’

‘জি ঠিক। উনার বাবা পুষতেন, এইজন্যে উনিও পুষেন। কুকুর পোষা তো স্যার অপরাধ না।’

‘বাড়িতে দারোয়ান, মালি, কাজের লোক কেউই নেই?’

‘জি না।’

‘উনি কি নিজেই রেঁধে খান?’

‘জানি না, স্যার। কখনো জিজ্ঞেস করি নি।’

‘আপনি কি ঐ বাড়িতে কোনো মহিলা দেখেছেন?’

‘আমি ঐ বাড়িতে কখনো যাই নি।’

মিসির আলি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন, স্বাভাবিক গলায় বললেন—রূপবতী একটি মেয়ে যে মুশফেকুর রহমান সাহেবের কাছে মাঝে মধ্যে আসে তার নাম কী?

রশিদ মোল্লা দৃঢ় গলায় বলল, উনার কাছে কোনো মহিলা কখনো আসে না, স্যার।

‘আপনি কি নিশ্চিত?’

‘জি স্যার।’

মিসির আলি বললেন, আগের ম্যানেজার সাহেবের মেয়ের নাম কী?

‘স্যার আমি জানি না।’

‘মেয়েটি দেখতে কেমন?’

‘উনাকে আমি কোনোদিন দেখি নাই। কী করে বলব দেখতে কেমন?’

‘কোনোদিন দেখেন নি, তা হলে মুশফেকুর রহমানের মাকে কী করে বললেন খুব সুন্দর মেয়ে?’

রশিদ মোল্লা হতভম্ব গলায় বলল, স্যার, আপনি কি আই.বি.-র লোক?

মিসির আলি হাসলেন। হ্যাঁ–না কিছু বললেন না। লক্ষ করলেন রশিদ মোল্লা তীব্র ভয়ে অস্থির হয়ে গেছে। চা এসেছে। সে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলেছে। কিছুটা চা ছলকে তার শার্টে পড়েছে।

'আগের ম্যানেজার সাহেব কোথায় থাকেন আপনি জানেন?'

'জি না, স্যার, জানি না। বিশ্বাস করুন জানি না। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলতে পারি।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'ভয় পাচ্ছি না তো। কেন শুধু শুধু ভয় পাব! আমি কোনো পাপ করলে ভয় পেতাম। আমি কোনো পাপ করি নি।'

'কোনো পাপ করেন নি?'

'ছোটখাটো পাপ করেছি। সে তো স্যার সবাই করে। মানুষ মাত্রই পাপ করে।'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মেয়েটার সঙ্গে শেষ কবে আপনার কথা হয়?

রশিদ মোল্লা ভয়ংকর চমকে উঠে বলল, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি।

মিসির আলি কিছু বললেন না। নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন। রশিদ মোল্লা রীতিমতো ঘামতে শুরু করল।

'রশিদ সাহেব!'

'জি স্যার।'

'আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি সত্য গোপন করে ভয়ের কারণ ঘটাতে পারেন। কী কথা হল তার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে স্যার কোনো কথা হয় নি। একবারই আমি উনাকে দেখেছি। তাও বছরখানেক আগে। অফিসে আসলেন। পরিচয় দিলেন। আমি খাতির করে বসালাম। তখন লক্ষ করলাম খুবই সুন্দর মেয়ে। উনি বললেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।'

আমি বললাম, স্যারের সঙ্গে কথা হবে না। উনি কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। যা বলার আমাকে বলতে হবে। উনি তখন স্যারের একটা চিঠি দেখালেন। স্যার চিঠি লিখে উনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি এই কথা স্যারকে বললাম। স্যার খুবই অবাক হলেন। স্যার বললেন, চিঠিটা নিয়ে এস, মেয়েটাকে বল চলে যেতে।

'আপনি তাই করলেন?'

'তাই করলাম। তবে মেয়ে স্যার চিঠি দিল না। চিঠি নিয়েই চলে গেল। খুব কাঁদছিল। আমার স্যার এমন মায়া লাগল!

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। হালকা গলায় বললেন, উঠি। রশিদ মোল্লা তাঁকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। মিসির আলি বললেন, আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না। আপনি নিজ থেকে যদি কিছু বলতে চান—বলতে পারেন।

রশিদ মোল্লা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি আপনাকে যা বললাম, এর বেশি আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুন। কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলতে বললে আমি কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলব।

‘আপনি তা হলে আর কিছু বলতে চান না?’

‘জি না।’

‘আর একটিমাত্র প্রশ্ন—আপনার বসার ঘরে টাটকা গোলাপ ফুল দেখলাম—আপনার গাছের গোলাপ?’

‘জি স্যার। আমার মেয়ের টবে হয়েছে। এই গোলাপগুলোর নাম তাজমহল। স্যার দাঁড়ান, আপনার জন্যে কয়েকটা ফুল নিয়ে আসি।’

মিসির আলি গোলাপের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৬

বাড়ি ফিরে মিসির আলি দেখলেন খাঁচায় দুটি চড়ুই পাখি। বদু পাখির খাঁচার সামনে বসে মুগ্ধ হয়ে পাখি দেখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এর আগে সে চড়ুই পাখি দেখে নি। এই প্রথম দেখছে। এবং পাখির সৌন্দর্যে সে অভিভূত। মিসির আলি গায়ের কোট খুলতে খুলতে বললেন, কেউ এসেছিল?

‘জে না।’

মিসির আলি আশাহত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মুশফেকুর রহমান হয়তো এসেছিল। চড়ুই পাখি দুটিকে সে-ই খাঁচায় ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। এখন বুঝা যাচ্ছে এই জটিল কাণ্ডটি করেছে বদু। খাঁচা এবং চড়ুই পাখির প্রতি বদুর এই অতি আগ্রহের কারণ এখন পরিষ্কার হল।

‘পাখি দুইটা আপনে আপনে হান্দাইছে।’

‘তাই নাকি?’

‘হ। আমি ঘর ঝাঁট দিতেছিলাম দেখি ভিতরে বইয়া কুটুর কুটুর চায়। আমি দৌড় দিয়া ঝপাং কইরা খাঁচার দরজা বন্ধ করলাম।’

‘গুড।’

‘বাটিত কইরা পানি দিলাম। পানি খাইছে। চুমুক দিয়া খাইছে।’

‘আচ্ছা।’

মিসির আলি পাখি দুটির প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গেলেন। কয়েকটা জরুরি বিষয় লিখে ফেলা দরকার। বদু বলল, ভাত দিমু স্যার?

‘দাও।’

বদু ভাত বাড়তে গেল না। উবু হয়ে খাঁচার সামনে বসে রইল। মিসির আলি নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, পাখি দুটি যদি বদু নিজে খাঁচায় না ঢোকাত তা হলে কি সে এতটা আগ্রহ বোধ করত? মুরগি ডিম পেড়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তোলে। যেসব মুরগি ডিম পাড়ার দৃশ্য দেখে তারা চুপ করে থাকে। সম্ভবত বিরক্তই হয়।

মিসির আলি খাতায় বড় বড় করে লিখলেন—মুশফেকুর রহমান। এটি হচ্ছে শিরোনাম। শিরোনাম বড় করেই লিখতে হয়। মূল অংশ থাকে ছোট হরফে লেখা। তিনি

দ্রুত লিখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে অবাক হয়ে দেখলেন তিনি যা লিখেছেন তা হচ্ছে—

মুশফেকুর রহমান

মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান।
মুশফেকুর রহমান মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান।
মুশফেকুর রহমান মুশফেকুর রহমান...

মিসির আলি নিজের লেখার দিকে খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপার বুঝতে পারছেন না। তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা কি এলোমেলো হয়ে গেছে? এরকম কাণ্ড তো আগে কখনো ঘটে নি। তিনি বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে এ জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি তো তিনি আগেও হয়েছেন, কখনো এমন বিচলিত বোধ করেন নি। এবার করছেন কেন?

মুশফেকুর রহমান নামের মানুষটি তাঁকে কি ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে? মানুষটি কি একজন মানসিক রোগী? নাকি সে ভান করছে? সে মানসিক রোগী হলে সমস্যা সহজ, সে যদি ভান করে তা হলে সমস্যা মোটেই সহজ নয়।

লোকটি তার কাছে কী চাচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়। শুরুতে সে বলেছে—সে একটি প্রেমের গল্প শোনাতে চায়। এখনো প্রেমের গল্পের অংশে আসা হয় নি। প্রেমের গল্পটি ভালোভাবে শোনা দরকার।

আগের ম্যানেজার সাহেবের মেয়ে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছে। তৃতীয় যে খুনটির কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে কি এই মেয়েটি যুক্ত? হবার সম্ভাবনাই বেশি। মুশফেকুর রহমানের পরিচিত লোকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই মেয়ে তার পরিচিতদের একজন। তবে যাকে হত্যা করা হবে তাকে কি কেউ চিঠি দিয়ে ডেকে আনবে? তাও অফিসে? এত বড় ভুল কি মুশফেকুর রহমান করবে? করার কথা নয়।

তবে ভয়ংকর বুদ্ধিমান কিছু মানুষও মাঝে মাঝে হাস্যকর বোকামি করে বসে। নিউ ইংল্যান্ডে জনি ম্যান নামের এক সাইকোপ্যাথের গল্প—ক্রিমিনোলজির বিখ্যাত গল্পের একটি। সে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে এগারটি খুন করল। নিখুঁত পরিকল্পনা, নিখুঁত কাজ। পুলিশের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু বারো নম্বর খুনটি সে করল নিতান্ত বোকার মতো। যে মেয়েটিকে খুন করবে তাকে এক পার্টি থেকে বের করে আনল। বের করে আনার আগে মেয়েটির সঙ্গে নাচল। ছবি তুলল। রাস্তায় এসে আইসক্রিমের দোকানে আইসক্রিম খেল। খুনের আধঘণ্টার মধ্যে সে ধরা পড়ল। পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, এত বড় বোকামি তুমি কী করে করলে? সে হাই তুলতে তুলতে বলল, আমার ধারণা ছিল শেষ খুনটি আমি খুব বুদ্ধি খাটিয়ে করেছি। আগের কাজগুলো ছিল বোকার মতো।

এরকম কোনো ব্যাপার তো মুশফেকুর রহমানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

আচ্ছা, তিনি নিজেও কি খুব বোকার মতো একটা কাজ করেন নি? তাঁর কি উচিত ছিল না ম্যানেজারের কাছ থেকে রানুর ঠিকানা নিয়ে আসা? ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানে।

রানুর ঠিকানা ছাড়াও মুশফেকুর রহমানের টেলিফোন নাম্বার আনা দরকার ছিল। এখন চলে গেলে কেমন হয়? রশিদ মোল্লাকে হকচকিয়ে দেওয়ার জন্যেও গভীর রাতে তার বাসায় উপস্থিত হওয়া দরকার।

'স্যার ভাত দিছি।'

মিসির আলি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন, ভাত পরে খাব রে বদু। আমি একটা কাজ সেরে আসি।

'কই যাইবেন?'

'একটা কাজ সেরে আসি। খুব জরুরি।'

'ভাত খাইয়া যান। ভাত খাইতে কয় মিনিট লাগব।'

'এসে খাব।'

মিসির আলি রশিদ মোল্লার বাসায় রাত সাড়ে এগারোটায় উপস্থিত হলেন। এত দেরি হবার কারণ তিনি বাসা ভুলে গেছেন। দু ঘণ্টা আগে যে বাড়িতে এসেছেন সেই বাড়ির ঠিকানা ভুলে যাওয়া একটা বিস্ময়কর ঘটনা। এই বিস্ময়কর ঘটনাই তাঁর জীবনে ঘটল।

রশিদ মোল্লা বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কলিংবেল শুনে দরজা খুললেন। আঁতকে উঠে শুকনো গলায় বললেন, কী ব্যাপার স্যার?

মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, ভালো আছেন?

রশিদ মোল্লা এই সামাজিক সৌজন্যমূলক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, আপনার বাসায় কি টেলিফোন আছে?

'জি আছে।'

'একটা টেলিফোন করব।'

'আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন আপনি। টেলিফোন সেটটা শোবার ঘরে। আমি নিয়ে আসছি।'

রশিদ মোল্লার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের অন্য সবাইও জেগে উঠেছে। অল্পবয়সী একটি মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে গেল। মনে হচ্ছে—এই মেয়েটিই গোলাপের চাষ করে। তিনি রশিদ মোল্লাকে হকচকিয়ে দিতে এসে পরিবারের সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছেন।

'নিন স্যার, টেলিফোন করুন। কত নাম্বারে করবেন?'

মিসির আলি বললেন, আপনি নাম্বারটা বলুন?

রশিদ মোল্লা বললেন, কী নাম্বারের কথা বলছেন?

'মুশফেকুর রহমানের টেলিফোন নাম্বারটা বলুন। নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে। আপনি তার নাম্বারও জানেন।'

'এখন টেলিফোন করে লাভ হবে না স্যার। উনি এখন টেলিফোন ধরবেন না। সন্ধ্যার পর উনি টেলিফোন ধরেন না।'

'তবু চেষ্টা করে দেখি। নাম্বারটা বলুন।'

'উনি যদি জানেন আমি নাম্বার দিয়েছি তা হলে খুব রাগ করবেন।'

'উনি জানবেন না।'

রশিদ মোল্লা শুকনো গলায় নাম্বার বললেন, দু বার রিং হতেই ওপাশ থেকে টেলিফোন উঠানো হল। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিসির আলি কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। কেউ একজন খুব হালকাভাবে টেলিফোন সেটের উপর নিশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, হ্যালো!

ওপাশ থেকে ভারী গম্ভীর গলায় বলল, মিসির আলি সাহেব?

'জি।'

'আপনার টেলিফোন কলের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

গলার স্বর সম্পূর্ণ অচেনা। শুদ্ধ ভাষায় কেউ কথা বলছে—কিন্তু এর মধ্যেই গ্রাম্য টান আছে। পুরুষকণ্ঠ, তবে এই কণ্ঠের সঙ্গে মুশফেকুর রহমানের কণ্ঠস্বরের কোনো মিল নেই। গলার স্বর মানুষ বদলাতে পারে, কিন্তু এতটা পারে না। মিসির আলি বললেন, আপনি কে বলছেন?

'আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় নি। আমি তন্ময়ের টিচার ছিলাম। ওকে অঙ্ক শেখাতাম। তন্ময় সম্ভবত আমার কথা বলেছে আপনাকে?'

'হ্যাঁ বলেছে।'

'শুনুন মিসির আলি সাহেব, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। কবে আসবেন?'

'বুঝতে পারছি না কবে আসব। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ভালোও লাগে না।'

'ভালো লাগে না কী করে বললেন? আগে কি কখনো প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'আপনার সঙ্গে বলছি।'

'বাহ্, আপনি মানুষ হিসেবেও তো রসিক। একবার আসুন। আসবেন?

'আসতেও পারি।'

'দেরি না করে চলে আসুন। আজ রাতেই চলে আসুন।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা কী?'

'রশিদ মোল্লাকে জিজ্ঞেস করুন। ও আপনাকে ঠিকানা বলে দেবে। আপনি ওর বাসা থেকেই তো টেলিফোন করছেন। তাই না?'

'জি।'

'কিংবা এক কাজ করতে পারেন। ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে পারেন। ও দারুণ ভীতু। ওকে একটা ধমক দিলেই ও আপনার সঙ্গে আসবে এবং দূর থেকে বাসা দেখিয়ে দেবে। কাছে আসবে না। সন্ধ্যার পর বাসার কাছে আসতে সে ভয় পায়?'

'আজ আসতে পারছি না। তবে হয়তো শিগগিরই আসব।'

'শুনুন মিসির আলি সাহেব, আজ আসাই ভালো। জোছনা রাত আছে। জোছনা আপনার ভালো লাগে নিশ্চয়ই।'

'ভালো লাগে না। জোছনা অনেক রহস্য তৈরি করে। রহস্য আমি পছন্দ করি না বলেই দিনের আলো জোছনার চেয়ে বেশি ভালো লাগে।'

'রহস্য আপনি পছন্দ করেন না?'

'জি না।'

'এই জন্যেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। চলে আসুন।'

'আসব আসব, এত ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এই জন্যেই বলছি। ও আরেকটা কথা—আগের ম্যানেজারের মেয়েটির ঠিকানা রশিদ মোল্লা জানে না। বের করার চেষ্টা করেছে। পারে নি। তবে আমি আপনাকে ঠিকানা দিতে পারি। ওরা নারায়ণগঞ্জে থাকে। আপনার কাছে কি কাগজ-কলম আছে? থাকলে লিখে নিন...'

মিসির আলি বললেন, থাক, ঠিকানার প্রয়োজন নেই।

'আমি যে এতকিছু জানি আপনি কি এতে অবাক হচ্ছেন না।'

'আমি এত সহজে অবাক হই না। আপনার নাম তো জানা হল না।'

'দেখা হলেই নাম বলব। এত তাড়া কিসের?'

মিসির আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে রশিদ মোল্লাকে বললেন, চলি রশিদ সাহেব। অনেক রাতে আপনাকে বিরক্ত করেছি। কিছু মনে করবেন না।

রশিদ মোল্লা কিছু বলল না। জবুথবু হয়ে বসে রইল। এই শীতের রাতেও তার কপালে ঘাম। সে খুব ভয় পেয়েছে।

আগের বার রশিদ মোল্লা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। এবার এল না। দরজা বন্ধ করতেও উঠল না। রশিদ মোল্লার মেয়েটি দরজা বন্ধ করার জন্যে উঠে এসেছে। সে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। তার বাবার মতো মেয়েটিও ভয় পেয়েছে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। বুদ্ধি করে মাফলার এনেছেন বলে রক্ষা। মাফলার ভেদ করে শীতল হাওয়া ঢুকছে। নাক জ্বালা করা শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা মনে হয় লেগে যাবে। নিউমোনিয়ায় না ধরলে হয়। শরীর দুর্বল। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরোপুরি গেছে। ছোট অসুখই দেখতে দেখতে ভয়াবহ হয়ে যায়।

আজকের রাতের ঘটনায় তিনি তেমন বিস্মিত বোধ করছেন না। বড় ধরনের রহস্যময় ঘটনায় তিনি তেমন বিস্মিত হন না। ছোটখাটো ঘটনাগুলো বরং তাঁকে অনেক বেশি অভিভূত করে। একবার এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে ছ'টাকা ভাড়া ঠিক করে রিকশায় উঠলেন। নামার সময় তাকে একটা পাঁচ টাকা এবং একটা দু টাকার নোট দিলেন। দু টাকার নোটটা ছিল পাঁচ টাকার নোটের ভেতর। রিকশাওয়ালার তা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল এবং লুঙ্গির খুঁট থেকে একটা এক টাকার নোট ফেরত দিল। মিসির আলি বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। একবার ভাবলেন, রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, সে কী করে বুঝল পাঁচ টাকার নোটের ভাঁজে একটা দু টাকার নোট আছে? তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন নি। থাক না কিছু রহস্য। সব রহস্য ভেঙে দেওয়ার দরকার কি?

পৃথিবীতে কিছু কিছু রহস্য আছে যা ভাঙতে ইচ্ছে করে, আবার কিছু রহস্য আছে ভাঙতে ইচ্ছা করে না। তন্ময় নামের ছেলেটির রহস্য ভেদ করার ইচ্ছা তাঁর আছে। ব্যাপারটা খুব সহজ হবে কিনা তা তিনি এখনো জানেন না।

রশিদ মোল্লার বাসা থেকে তিনি টেলিফোন করলেন। অন্য একজন ধরল। তা ধরতেই পারে। হয়তো তন্ময়ের বাড়িতে আরো একজন থাকে। যে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে মাস্টার সাহেব হিসেবে। সে চট করে বলে দিল, আপনি রশিদ মোল্লার বাড়ি থেকে টেলিফোন করছেন? আপাতদৃষ্টিতে খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা মনে হলেও হয়তো তেমন আশ্চর্যজনক নয়। রশিদ মোল্লাই আগেভাগে জানিয়েছে। মিসির আলি অপেক্ষা করছিলেন—রশিদ মোল্লা টেলিফোন সেট আনতে গেল। চট করে আনল না। দেরি হল। এই ফাঁকে রশিদ মোল্লা হয়তো জানিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া ঐ লোকটি প্রাণপণ চেষ্টা করছিল মিসির আলিকে বিস্মিত করতে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, "আমি যে এতকিছু জানি আপনি এতে অবাক হচ্ছেন না?" একজন প্রেতাত্মা মানুষকে বিস্মিত করার এত চেষ্টা করবে না। মানুষই করবে। তন্ময়ের মৃত শিক্ষক টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে এই হাস্যকর ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাবার মানুষ মিসির আলি নন। তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। তবে চিন্তিত বোধ করছেন। কেন চিন্তিত বোধ করছেন তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়।

তিনি বিপদ আঁচ করছেন। তাঁর মনের একটি অংশ ভয় পাচ্ছে। ভয় পাবার পেছনের কারণটি তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু যে ভয় পাচ্ছেন তা না—পুরো ব্যাপারটা তাঁর মনের ওপর এক ধরনের চাপও সৃষ্টি করছে। কে যেন খুব অস্পষ্টভাবে তাঁকে বলছে—তুমি সরে এস। তুমি দূরে সরে এস।

টুং টুং ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা আসছে। ভিড়ের সময় রিকশাওয়ালারা কখনো ঘণ্টা বাজায় না। ফাঁকা রাস্তা বলেই হয়তো ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে আসছে। এই রিকশা ভাড়া যাবে বলে মনে হয় না। যাচ্ছে উল্টো দিকে। তবু মিসির আলি বললেন, ভাড়া যাবে?

মিসির আলিকে বিস্মিত করে দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, যামু। এই শীতের রাইতে খামাখা রিকশা বাইর করছি? টাইট হইয়া বহেন। পঙ্খীরাজের মতো লইয়া যামু।

মিসির আলি টাইট হয়ে বসলেন। এই রিকশায় বসাই তাঁর কাল হল। রিকশাওয়ালা ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল ঠিকই কিন্তু ক্ষতি যা করার করে ফেলল। ভয়াবহ ঠাণ্ডা লেগে গেল। মিসির আলি ঘরে ঢুকেই বিছানায় পড়লেন। প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বুক পাথরের মতো ভারী, শ্বাস নিতে পারেন না। আচ্ছন্নের মতো মাঝে মাঝে তাকান, তখন মনে হয় মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা তাঁর কাছে নেমে আসছে। একসময় মনে হল, ফ্যানের ব্লেড ঘুরতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। হেলুসিনেশন। তাঁর হেলুসিনেশন হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারেন বদু তাঁর মাথায় পানি ঢালছে। সেই পানি তাঁর কাছে উষ্ণ মনে হয়। বদু কি তাঁর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালছে? বিছানার এক পাশে চড়ুই পাখির খাঁচা। খাঁচার ভেতর পাখি দুটিকে ঘুঘু পাখির মতো বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারাও এক দৃষ্টিতে মিসির আলিকে দেখছে। শেষ রাতের দিকে তিনি অচেতনের মতো হয়ে গেলেন। জ্বরের প্রচণ্ড ঘোর, আধো-চেতন-আধো-জাগ্রত অবস্থায় তিনি নীলুকে দেখলেন।

নীলু যেন এসেছে তাঁর কাছে। বসেছে বিছানার পাশে। কি স্পষ্টই না তাকে দেখাচ্ছে। কানের দু পাশের চুল যে বাতাসে কাঁপছে তাও দেখা যাচ্ছে। নীলু বলল, আবার অসুখ বাঁধিয়েছেন? মিসির আলি হাসার চেষ্টা করলেন।

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'হুঁ।'

'বলুন আমি কে?'

'নীলু।'

'কতদিন পর আপনাকে দেখতে এলাম বলুন তো?'

'তুমি আমাকে দেখতে আস নি। সবই আমার কল্পনা। প্রচণ্ড জ্বরের জন্যে আমি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছি। ঘোরের কারণে মস্তিষ্কের নিউরনে সঞ্চিত স্মৃতি উলটপালট হয়েছে। সে তোমাকে তৈরি করেছে। বাস্তবে তোমার অস্তিত্ব নেই। আমি হাত বাড়ালে তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারব না।'

'এখনো লজিক?'

'হ্যাঁ, এখনো লজিক।'

'দেখুন না একটু হাত বাড়িয়ে আমাকে ছুঁতে পারেন কিনা।'

'পারছি না, নীলু। আমার হাত-পা পাথরের মতো ভারী হয়ে এসেছে।'

'আমি কেন এসেছি বলুন তো?'

'আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে এসেছ। কেউ যখন ভয়ংকর অসুস্থ হয় তখন তার চারপাশের জগৎও শূন্য হয়ে পড়ে। তার মস্তিষ্ক তখন তার জন্যে একজন সঙ্গী তৈরি করে।'

'আপনার লজিক ঠিক আছে। আপনি অসুস্থ নন।'

'তুমি চলে যাও, নীলু। আমি কথা বলতে পারছি না। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'আমি চলে যেতে পারছি না। আমি তো নিজ থেকে আসি নি—আপনি আমাকে এনেছেন।'

ঘোরের মধ্যে মিসির আলি ছটফট করতে লাগলেন। নীলু তাঁর দিকে ঝুঁকে এল। মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটা এত কাছে এগিয়ে আসছে কেন? এটা ঠিক হচ্ছে না। নীলু এখন ফিসফিস করে বলল, আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। আপনি ভয়াবহ বিপদের দিকে যাচ্ছেন। পুরোনো ঢাকার ঐ বাড়িতে আপনি কখনো যাবেন না। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আপনার দেখা না করলেও চলবে। প্লিজ, আপনি আমার কথা শুনুন।

মিসির আলির জ্বর আরো বাড়ল। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে একটা রেলগাড়ি চলছে। চাকার ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ বারবার বলছে—আপনি আমার কথা শুনুন। আপনি আমার কথা শুনুন।

৭

মিসির আলির জ্ঞান কতদিন পর ফিরল তা তিনি জানেন না। চোখ মেলে দেখলেন প্রশস্ত একটি ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। বিছানা অপরিচিত। চারপাশের পরিবেশ অপরিচিত। পায়ের কাছে মস্ত কাচের জানালা। জানালা বন্ধ। কাচের ভেতর দিয়ে রোদ এসে তাঁর

পায়ে পড়েছে। খুব আরাম লাগছে। তাঁর গায়ে সুন্দর একটা কম্বল। কম্বল থেকে ওষুধের গন্ধ আসছে। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুধাও বোধ করছেন। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন কিছু খাচ্ছেন না। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। ঘরে প্রচুর আলো। এত কড়া আলোতে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

'জি ভালো।'

'আপনার জ্বর পুরোপুরি রেমিশন হয়েছে। আপনি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

মিসির আলি চোখ খুললেন। আলো এখন আর আগের মতো চোখে লাগছে না। তাঁর বিছানার পাশে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন ডাক্তার। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলানো দেখে তাই মনে হয়। নার্সরাও স্টেথিসকোপ ব্যবহার করে, তবে তারা কখনো গলায় পরে না।

মিসির আলি বললেন, আমি প্রচণ্ড খিদে বোধ করছি।

'আপনি খিদে বোধ করছেন। এটা খুবই সুলক্ষণ। হালকা কিছু খাবার দিতে বলছি।'

'এটা কি হাসপাতাল?'

'হাসপাতাল তো বটেই। তবে প্রাইভেট হাসপাতাল।'

'আমি কতদিন ধরে আছি?'

"আজ হচ্ছে ফিফথ ডে। আপনার অবস্থা এমন ছিল যে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনি 'কমা'য় চলে যাচ্ছেন।"

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, কমা-সেমিকোলনে আমি যাব না। যদি যেতে হয় সরাসরি ফুলস্টপে চলে যাব।

ডাক্তার হাসলেন। মিসির আলির মনে হল বেশিরভাগ ডাক্তার হাসেন না। তবে যাঁরা হাসেন তাঁরা খুব সুন্দর করে হাসেন।

'মিসির আলি সাহেব!'

'জি।'

'আপনি বিশ্রাম করুন। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি আপনার খাবারের ব্যবস্থা করছি।'

'আজকের একটা খবরের কাগজ কি পেতে পারি?'

'অবশ্যই পেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় খবরের কাগজ পড়ার চেয়ে বিশ্রাম আপনার জন্যে অনেক জরুরি। নাশতা খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিন। চোখ বন্ধ করে ফেলুন।'

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর অনেক কিছু জানার ছিল। কে তাঁকে এমন এক আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিল? ঘরের যা সাজসজ্জা তাতে মনে হয় হাজারখানেক টাকা হবে দৈনিক ভাড়া। দেয়ালে ছোট্ট বারো ইঞ্চি টিভি দেখা যাচ্ছে। রোগীর বিনোদনের ব্যবস্থা। ঘরের দেয়াল, মেঝে সবই ঝকঝক করছে। কোথাও কোনো ঘড়ি নেই। টিভির চেয়েও ঘড়ির প্রয়োজন ছিল বেশি। কোন এক বিচিত্র কারণে অসুস্থ হলেই ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করে।

নার্স নাশতা নিয়ে এল। এক স্লাইস রুটি। ডিম পোচ, একটা কমলা। গরম এক কাপ চা।

মিসির আলি বললেন, সিগারেট কি খাওয়া যাবে সিস্টার?

'না, সিগারেট খাওয়া যাবে না। এটা হাসপাতাল, ধূমপানমুক্ত এলাকা।'

'গরম চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে পারলে আমার অসুখ পুরোপুরি সেরে যেত বলে আমার ধারণা।'

'এখানকার ডাক্তারদের সে রকম ধারণা না। কাজেই সিগারেট খেতে পারবেন না। নাশতা খেয়ে নিন। আপনার গা আমি স্পঞ্জ করে দেব।'

'এই রুমটার ভাড়া কত?'

'প্রতিদিন পনের শ টাকা।'

মিসির আলির মুখ শুকিয়ে গেল। তিন হাজার টাকায় তিনি এবং বদু সারা মাস চালান। তার মধ্যে বাড়িভাড়া ধরা আছে।

নার্স কঠিন মুখ করে বলল, বড়লোকদের চিকিৎসার খুব ভালো ব্যবস্থা বাংলাদেশে আছে। মিসির আলি বললেন, অবশ্যই আছে। তবে মজার ব্যাপার কি জানেন সিস্টার—এত করেও বড়লোকরা কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান না। গরিবরা যেভাবে মরে তাদেরও ঠিক একইভাবে মরতে হয়।

'এখন হয়, একদিন হয়তো হবে না। দেখা যাবে অমর হবার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ টাকা দাম। শুধু বড়লোকরা সেই ওষুধ কিনতে পারছে।'

মিসির আলি তার গোছানো কথায় চমৎকৃত হলেন। অধিকাংশ মানুষই আজকাল গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। চিন্তা এলোমেলো থাকে বলে কথাবার্তাও থাকে এলোমেলো।

'সিস্টার, আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে। আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য চাচ্ছি। আমার পক্ষে প্রতিদিন পনের শ টাকা ভাড়া দিয়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র মানুষ। এ কদিনের ভাড়া কী করে দেব তাই বুঝতে পারছি না। আমি আজই এখান থেকে বিদেয় হতে চাই। সেটা কী করে সম্ভব তা আপনি দয়া করে বলে দেবেন। যে টাকা আপনারা পান তাও একসঙ্গে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। আমাকে ভাগে ভাগে দিতে হবে। তার একটা এ্যারেঞ্জমেন্টও করতে হবে।'

'স্যার, আপনাকে এসব নিয়ে মোটেই ভাবতে হবে না। আমাদের হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে—ভর্তি হবার সময়ই পুরো টাকা দিতে হয়। আপনার বেলাতেও তাই হয়েছে। কেউ-একজন নিশ্চয়ই পুরো টাকা দিয়েছেন।'

'সেই কেউ-একজনটা কে?'

'আমি তো স্যার বলতে পারব না। আপনি চাইলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

'দয়া করে খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

নার্স কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। তার হাতে একটি বই, একটি মুখ বন্ধ খাম।

'স্যার, যিনি আপনাকে এখানে ভর্তি করিয়ে গেছেন, তাঁর নাম মুশফেকুর রহমান। তিনি আপনার জন্যে বইটা রেখে গেছেন। চিঠিও রেখে গেছেন। আর স্যার আমি খোঁজ নিয়েছি—আপনার জন্যে পনের দিনের রুম পেমেন্ট করা আছে। তার আগেই যদি আপনি চলে যান তা হলে টাকাটা রিফান্ড করা হবে।'

মিসির আলি চিঠি পড়লেন। সুন্দর হাতের লেখা। এই লেখা দেখে আগেও একবার মুগ্ধ হয়েছিলেন, আজো হলেন।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি আপনাকে এই প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে এসেছি। আপনার বিনা অনুমতিতেই এটা করতে হল। কারণ অনুমতি দেওয়ার মতো অবস্থা আপনার ছিল না।

আপনার পাখি দুটি আমি আমার নিজের কাছে নিয়ে রেখেছি। আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আমি চালিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। ফলাফল এখন পর্যন্ত শূন্য। দুটি পাখিই খাচ্ছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখব।

আপনি অসুস্থ অবস্থায় নীলু নীলু বলে ডাকছিলেন। ভদ্রমহিলার ঠিকানা জানার জন্যে আমি আপনার কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আপনার অবস্থা দেখে আমি খুবই শঙ্কিত বোধ করছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল ঐ মহিলাকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করা দরকার।

আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। তবে এখনো আপনার কোনো খবর তাঁকে দেওয়া হয় নি। আপনি চাইলেই দেওয়া হবে। পাখিবিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম—Mysteries of Migratory Birds. আমি বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি—আপনিও পাবেন বলেই আমার ধারণা।

বিনীত

ম. রহমান

মিসির আলি পরপর তিনবার চিঠি পড়লেন। সব দীর্ঘ চিঠিতেই অপ্রকাশ্য কিছু কথা থাকে। যে কথা পত্রলেখকের মনে আছে, কিন্তু তা তিনি জানাতে চান না। সেই অপ্রকাশ্য কথা পত্রলেখকের অজান্তে ধরা পড়ে। এখানেও কি ধরা পড়েছে? না, পড়ে নি। এই চিঠি খুব সাবধানে লেখা হয়েছে।

পাখির ওপর লেখা বইটিতে মিসির আলিকে উদ্দেশ্য করে দুটা লাইন লেখা :

দ্রুত সেরে উঠুন। এই শুভ কামনা।

তন্ময়।

একটি বিষয় লক্ষণীয়—সে দুটি নাম ব্যবহার করেছে। এর থেকে কি কিছু দাঁড় করানো যায়? না, যায় না। এত সহজে কিছু দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তথ্যের পাহাড় যোগাড় করতে হয়। সেই অসংখ্য তথ্যের ভেতর থেকে বেছে বেছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো নিয়ে ঘর বানাতে হয়। একটা নয়—বেশ কয়েকটা। তার থেকে বেছে নিতে হয় মূল প্রাসাদ...কঠিন কাজ।

নার্স মেয়েটি গামলা ভর্তি গরম পানি এবং একটা তোয়ালে নিয়ে এসেছে। গা স্পঞ্জ করবে। মিসির আলি বললেন, আমি কি আরেক পেয়ালা চা খেতে পারি?

'জি না স্যার। চা একটা উত্তেজক পানীয়। ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস না করে আপনাকে দেওয়া যাবে না।'

'আপনার নাম কী?'

'আমার নাম জাহেদা।'

'শুনুন জাহেদা, আপনি যদি আমাকে খুব গরম এক কাপ চা না খাওয়ান তা হলে আমি আপনাকে গা স্পঞ্জ করতে দেব না।'

জাহেদা চলে গেল। মিসির আলি খুশি মনে অপেক্ষা করছেন। মেয়েটির মোরালিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যখন ফিরে আসবে তখন তাকে বলা হবে—শুনুন জাহেদা, আপনি আমাকে একটা সিগারেট এনে দিন। আমাকে একটা সিগারেট না খাওয়ালে আমি ওষুধ খাব না। গোপনে এনে দিন। আমি বাথরুমে বসে খেয়ে নেব। কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না।

জাহেদা ফিরে এল। কঠিন গলায় বলল, ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি নিষেধ করেছেন। কাজেই চা হবে না। আপনি শার্ট খুলুন।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, তাঁর নিজের মোরালিটিই ভেঙে যাচ্ছে। শার্ট খুলে ফেলাই ভালো।

মিসির আলি ভেবেছিলেন তিনি পুরোপুরি সেরে গেছেন। দুপুরে শুয়ে শুয়ে পাখিবিষয়ক বইটি পড়তে পড়তেই তাঁর মাথা ধরল। সন্ধ্যাবেলা আবার জ্বর এল। দেখতে দেখতে জ্বর বেড়ে গেল। পুরো রাত কাটল জ্বরের ঘোরে। সকালে আবার ভালো। ডাক্তার যখন দেখতে এলেন তখন গায়ে জ্বর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। পরপর তিনদিন একই ব্যাপার। মিসির আলি ডাক্তারকে বললেন, কী ব্যাপার ডাক্তার সাহেব? আমার হয়েছে কী?

ডাক্তার সাহেব বললেন, এখনো বলতে পারছি না। টেস্ট করা হচ্ছে।

'কদিন থাকতে হবে?'

'তাও বলা যাচ্ছে না।'

মিসির আলি শঙ্কিত বোধ করছেন। হাসপাতালের আকাশছোঁয়া বিল অন্য একজন দিয়ে দেবে তা হয় না। পুরো বিল তিনিই দেবেন। কিছু টাকা তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন—ভয়াবহ দুঃসময়ের জন্যে। সেই টাকায় হাত দিতে হবে। রাজকীয় চিকিৎসা তাঁর জন্যে না। সরকারি হাসপাতালে যাওয়া দরকার। এই হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। প্রতিদিন ভোরবেলা অনেকখানি রোদ এসে তাঁর পায়ে পড়ে। এই দৃশ্যটি তাঁর অসাধারণ লাগে। অন্য কোনো হাসপাতালে এরকম হবে না। রোদে পা মেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকার এই আনন্দ থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না। একজন মানুষের জীবন হচ্ছে ক্ষুদ্র আনন্দের সঞ্চয়। একেক জন মানুষের আনন্দ একেক রকম। তাঁরটা হয়তোবা কিছুটা অদ্ভুত।

তিনি আজো রোদে পা মেলে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। হাসপাতালের নার্স তাঁকে জানিয়েছে—আজ তাঁকে বাড়তি এক কাপ চা দেওয়া হবে। শুধু তাই না, সিগারেটও দেওয়া হবে। তবে সিগারেট খেতে পারবেন না। হাতে নিয়ে বসে থাকবেন। তাই-বা কম কী। তামাকের গন্ধ নেওয়া হবে।

'কেমন আছেন স্যার?'

মিসির আলি চোখ না মেলেই বললেন, ভালো।

'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। আপনি মুশফেকুর রহমান। বসুন।'

চেয়ার টানার শব্দ হল। মিসির আলি ফুলের গন্ধ পেলেন। মুশফেকুর রহমান তাঁর জন্যে ফুল নিয়ে এসেছে। টেবিলে ভারী কিছু রাখার শব্দ হল। ফুল নয়—অন্যকিছু। ফল হতে পারে। কী ফল?

কমলা হবে না। কমলার ঘ্রাণ তীব্র। তিনি গন্ধ পাচ্ছেন না। সম্ভবত আপেল এবং কলা। না, কলা হবে না। আপেল এবং কলা এক ঠোঙায় আনা হবে না। তিনি একটি ঠোঙা রাখার শব্দ শুনেছেন। হয়তো আপেল। না, আপেলও হবে না। তিনি যে শব্দ শুনেছেন তাতে মনে হয়েছে শক্ত কিছু রাখা হয়েছে, যেমন ডাব। তবে ডাব হবে না। ডাব কেউ টেবিলে রাখবে না। মেঝেতে রাখবে—তা হলে কী?

মিসির আলি চোখ মেললেন, তবে টেবিলের দিকে তাকালেন না। তাকালেন মুশফেকুর রহমানের দিকে। তিনি এক ধরনের বিস্ময়বোধে আক্রান্ত হলেন। কোলের উপর হাত রেখে শান্ত, ভদ্র ও বিনয়ী একটা ছেলে বসে আছে।

তিনি মুশফেকুর রহমানকে দিনের আলোয় কখনো দেখেন নি। একজন মানুষকে দিনের আলোয় এক রকম দেখাবে, রাতে অন্য রকম তা তো হয় না। ছেলেটির মধ্যে মেয়েলি ভাব অত্যন্ত প্রবল। এ ব্যাপারটি তিনি আগে কেন লক্ষ করেন নি? ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। লাল ঠোঁট, বেশ লাল, চোখের মণি ঘন কালো এবং ছলোছলো। ইংরেজি উপন্যাসে চোখের বর্ণনায় পাওয়া যায়—Liquid eyes. এরও তাই। চোখের পল্লবও মেয়েদের চোখের মতো দীর্ঘ। বয়সও খুব বেশি নয়। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মতো হবে। তাঁর ধারণা ছিল মুশফেকুর রহমানের বয়স চল্লিশের বেশি।

মিসির আলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটি কথা বলছে এমনভাবে যে জিহ্বা দেখা যাচ্ছে না। তবু মিসির আলি লক্ষ করলেন ছেলেটির জিহ্বা কালো নয়। অন্য দশজনের মতোই।

মুশফেকুর রহমান বলল, স্যার, আপনি হেডমাস্টারদের মতো আমাকে দেখছেন। কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন।

'আপনার জিহ্বার রঙ কালো না।'

'দিনের বেলা রঙ ঠিক থাকে।'

'কেন?'

'আপনি বলুন কেন?'

'আপনি কি কোনো রঙ মাখেন?'

"জি স্যার, মাখি। এক ধরনের 'এজো ডাই'—নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রঙ। দিনের বেলা লোকজনের সামনে কালো জিব নিয়ে বেরুতে ইচ্ছা করে না।"

'আপনার বয়স কত?'

'তেত্রিশ। স্যার, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'বেশ বলব।'

'আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। শরীর সারুক। আমি সব সময় খোঁজ রাখছি।'

'থ্যাংক ইউ।'

'পাখিবিষয়ক বইটি কি নেড়েচেড়ে দেখেছেন?'

'আমি গোড়া থেকেই পড়ছি—পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো পড়া হয়েছে।'

'বই পড়তে কষ্ট হয় না?'

'না। তবে সন্ধ্যার পর কিছু পড়তে পারি না। তখন চোখ জ্বালা করে, মাথায় যন্ত্রণা হয়।'

মুশফেকুর রহমান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, স্যার, আমি আমার কিছু ঘটনা লিখে এনেছি। পড়তে যাতে আপনার কষ্ট না হয় সে জন্যে ভাগ ভাগ করে লিখেছি। প্রতিটি চ্যাপ্টারের শেষে আমি আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাও করেছি। আপনার ইচ্ছা না হলে ব্যাখ্যাগুলো পড়ার দরকার নেই।

মিসির আলি বললেন, কী ধরনের ব্যাখ্যা?

'একজন মনোবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা।'

'মনোবিজ্ঞানে তোমার কী কিছু পড়াশোনা আছে?'

মুশফেকুর রহমান বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, সামান্য আছে। আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। এই বিষয়ে এম. এ. করেছি।

'কোন সনের ছাত্র?'

'বলতে চাচ্ছি না, স্যার।'

মিসির আলি বললেন, তুমি কি কখনো আমার ছাত্র ছিলে?

'জি ছিলাম। গোড়া থেকে এই কারণেই আপনাকে স্যার ডাকছি। আপনার কাছে আসার আমার কারণও এইটিই। স্যার, আজ আমি উঠি?'

'তোমার ঐ ঠোঙায় কী আছে?'

'কিছু বেদানা নিয়ে এসেছি। টাইম পত্রিকায় পড়েছিলাম—বেদানায় আছে ভিটামিন K, রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরিতে ভিটামিন 'কে' খুব কাজ করে। নার্সকে বলে দিয়েছি, ও বেদানার রস তৈরি করে আপনাকে দেবে। স্যার যাই।'

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। হালকা নীল শার্ট পরা, মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুলের এই যুবকটিকে কী সুন্দর লাগছে! কিন্তু সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে! আগেও একবার খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখেছেন। সেবার বাঁদিকে ঝুঁকে হাঁটছিল। এখন হাঁটছে ডানদিকে ঝুঁকে।

৮

শ্রদ্ধেয় স্যার,

স্যারদের নামের আগে শ্রদ্ধেয় ব্যবহার করা আমাদের প্রাচীন রীতি। যদিও এই সমাজের বেশিরভাগ শিক্ষকরাই শ্রদ্ধেয় বিশেষণ দাবি করেন না। স্কুলে আমাদের একজন অঙ্ক স্যার ছিলেন। তিনি খুব ভালো অঙ্ক জানতেন। ছাত্রদের বুঝাতেনও খুব সুন্দর করে। তিনি আমাকে ডাকতেন—। সর্প-শিশু! মাঝে মাঝেই মজা করার জন্যে আমাকে বলতেন, এই কর তো। হাঁ করে তোর কুচকুচে কালো জিহ্বাটা নড়াচড়া কর। দেখি কেমন লাগে।

আমি তাই করতাম। তিনি মজা পেয়ে হো হো করে হাসতেন। এই শিক্ষককে কি শ্রদ্ধেয় বলা ঠিক হবে?

আমি আপনার নামের আগে বহুল-ব্যবহৃত বিশেষণ ব্যবহার করেছি। এর চেয়ে সুন্দর কিছু ব্যবহার করতে পারলে আমার ভালো লাগত। আপনি অল্প কিছুদিন আমাদের ক্লাস নিয়েছেন। পড়াতেন এবনরমাল বিহেভিয়ার। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আমি তোমাদের এবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াতে এসেছি। পড়ানোর সময় কী করলে আমার আচরণকে তোমরা এবনরমাল বলবে?

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। ছাত্র হিসেবে আমরা আপনাকে যাচাই করে নিতে চাচ্ছিলাম। আপনি বললেন, আচ্ছা, আমি যদি এই টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেই—তা হলে কি তোমরা আমার আচরণকে এবনরমাল বলবে?

একজন ছাত্র বলল, হ্যাঁ।

আপনি বললেন, প্রাচীন গ্রিসে কিন্তু ক্লাসরুমে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার প্রচলন ছিল। তাঁরা মনে করত শিক্ষক সবচেয়ে সম্মানিত। তাঁকে দিতে হবে সবচেয়ে সম্মানের স্থান। তাদের কাছে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়াটাকে অস্বাভাবিক আচরণ মনে হত না। কোনো শিক্ষক যদি মেঝেতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন সেইটা হতো অস্বাভাবিক। কাজেই অস্বাভাবিকের সংজ্ঞা কী? সংজ্ঞা হল—আমরা যা দেখে অভ্যস্ত তার বাইরে কিছু করাটাই অস্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হল মানুষ খুব অস্বাভাবিক একটি প্রাণী, অথচ আমরা মানুষের কাছে স্বাভাবিক আচরণ আশা করি। আচ্ছা, তোমরা একজন কেউ বল তো, মানুষ অস্বাভাবিক প্রাণী কেন?

ক্লাসের কেউ কথা বলল না। আপনি হাসিমুখে বললেন, মানুষ অস্বাভাবিক তার কারণ মানুষের মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক একই সঙ্গে লজিক এবং এন্টি-লজিক নিয়ে কাজ করে। প্রতিটি প্রশ্নের দুটি উত্তর সে সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে—একটি হ্যাঁ, অন্যটি না। সে মনে করে দুটি উত্তরই সত্য। তা হয় না।

প্রশ্ন : ঈশ্বর বলে কি কিছু আছেন? উদাহরণ দেই।
উত্তর : হ্যাঁ এবং না।
প্রশ্ন : আমরা কি শূন্য থেকে এসেছি?
উত্তর : হ্যাঁ এবং না।
প্রশ্ন : আমরা কি শূন্যতে মিশে যাব?
উত্তর : হ্যাঁ এবং না।

স্যার, আপনি ঝড়ের গতিতে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন এবং নিজেই উত্তর দিচ্ছেন—'হ্যাঁ এবং না।' আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত। ক্লাসের শেষে আপনার নাম হয়ে গেল 'হ্যাঁ-না' স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার, এই নাম আমরা কখনো ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করি নি। এই নাম উচ্চারণ করেছি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়।

লজিক ব্যবহার করার আপনার অস্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে আমাদের অল্প সময়ের ভেতর পরিচয় হল। শার্লক হোমস-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কোনান ডায়ালের উপন্যাসের মাধ্যমে। শার্লক হোমস কল্পনার চরিত্র। আমরা বাস্তবের

একজন সাধারণ মানুষকে দেখলাম যার চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা অতিমানব পর্যায়ের।

আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই ক্লাসে আপনি একটি এ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন। আমরা সবাই এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলাম। আপনি আমার খাতা দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, তুমি ক্লাসের পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি দেখা করতে গেলাম। আপনি বললেন, এত সুন্দর হাতের লেখা কেন? আপনার প্রশ্নের ভঙ্গি এমন যেন সুন্দর হাতের লেখা হওয়া দূষণীয়। আমি বললাম, স্যার, সুন্দর হাতের লেখা কি অপরাধ?

আপনি হাসতে হাসতে বললেন, না, অপরাধ হবে কেন? তবে হাতের লেখার দিকে তুমি অস্বাভাবিক নজর দিচ্ছ। এটাই আমাকে বিস্মিত করছে। যাদের মনের ভেতরের অবস্থাটা থাকে বিশৃঙ্খল, এবং হয়তো বা অসুন্দর তারা বাইরের পৃথিবীটাকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল দেখতে চায়, যে কারণে হাতের লেখার মতো তুচ্ছ একটি বিষয়েও তাদের অপরিসীম মনোযোগী হাতে দেখা যায়। তোমার কি কোনো সমস্যা আছে?'

আমি বললাম, না।

আমি যে মিথ্যা বলছি আপনি তা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন। সেটা আমি আপনার হাসি দেখেই বুঝলাম। তবে আপনি আমাকে মিথ্যা বলার জন্যে অভিযুক্ত করলেন না। শান্ত গলায় বললেন, তোমার রিপোর্টটি পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। সবাই বইপত্র ঘেঁটে রিপোর্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছে। একমাত্র তুমিই—নিজে যা ভেবেছ তাই লিখেছ।

রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল—'Strange dreams' বা অদ্ভুত স্বপ্ন। আমি আমার নিজের দেখা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন লিখে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি বললাম, স্যার, আমার ব্যাখ্যা কেমন হয়েছে?

আপনি বললেন, বায়াস্‌ড্‌ ব্যাখ্যা হয়েছে। যেহেতু তুমি স্বপ্নটি দেখেছ সেহেতু তুমি তা ব্যাখ্যা করেছ নিজের দিকে পক্ষপাতিত্ব করে। আমি অন্য ব্যাখ্যা করব।

'আপনার ব্যাখ্যা কী স্যার?'

আপনি বললেন, আমার ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তুমি আসলেই এ জাতীয় স্বপ্ন দেখেছ কি না। মানুষ কখনো তার অভিজ্ঞতার বাইরে স্বপ্ন দেখে না, মানুষের কল্পনা অভিজ্ঞতার ভেতর সীমাবদ্ধ। একজন শিল্পীকে তুমি যদি দৈত্যের ছবি আঁকতে দাও—সে এক চোখ এক দৈত্যের ছবি আঁকবে—যার দুটি শিং আছে। তুমি খুব মন দিয়ে লক্ষ করলে দেখবে—দৈত্যের হাত-পা দেখাচ্ছে মানুষের মতো। কপালে চোখটা বিড়ালের মতো, মাথার শিং দুটি গরুর মতো। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাই কল্পনায় ব্যবহার করেছেন। দৈত্যের ছবিতে তুমি এক শিঙের দৈত্য পাবে কিন্তু তিন শিঙের দৈত্য সচরাচর পাবে না। কারণ মানুষ একশিঙের প্রাণী দেখেছে—যেমন গণ্ডার, দু শিঙের প্রাণী দেখেছ গরু, ছাগল কিন্তু তিন শিঙের প্রাণী দেখে নি। বুঝতে পারছ কী বলছি?

'পারছি স্যার।'

'কিন্তু তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ বলে লিখেছ এই স্বপ্ন তুমি দেখতে পার না। এই স্বপ্ন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।'

আমি বললাম, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি স্যার।

আপনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও। যদি কখনো বড় ধরনের সমস্যায় পড় আমার কাছে এস।

আপনার কি মনে পড়ে আপনি এ জাতীয় একটি আশ্বাসবাণী আপনার একজন ছাত্রকে দিয়েছিলেন? হয়তো আপনার মনে নেই। আমি কিন্তু মনে করে রেখেছি। এবং সব সময় আপনার খোঁজ রেখেছি। গত সাত বছরে আপনি কোন কোন বাসায় ছিলেন, কতদিন ছিলেন—সব আমি একের পর এক বলে দিতে পারব। এর পরেও আমাকে আপনার অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

স্যার, সমস্যায় আমি এখন পড়ি নি। সমস্যায় পড়েছিলাম ছেলেবেলাতেই। সেই সমস্যা আমি আমার নিজের মতো করে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। আমাকে সাহায্য করেছেন আমার একজন গৃহশিক্ষক। যিনি জীবিত নন। মৃত। মৃত মানুষটি এখনো আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। আপনার মতো যুক্তিবাদী মানুষের কাছে নিতান্তই অযৌক্তিক একটি বিষয় উত্থাপন করলাম। করলাম, কারণ, আপনি বলেছেন মানুষ যে কোনো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে হ্যাঁ এবং না দুটিই গ্রহণ করে। আমি আমার গৃহশিক্ষকের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তার আগে আমার কিছু কথা জেনে নিতে হবে।

আমি নিজে আমার কথা ছাড়া ছাড়া ভাবে আপনাকে কিছু বলেছি। আপনি নিজেও অনুসন্ধান করে কিছু কিছু বের করার চেষ্টা করেছেন। এতে লাভ তেমন হয় নি। আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনি আমার মার সঙ্গে কথা বলেছেন—তাঁকে আপনার নিশ্চয়ই সরল সাদাসিধে মহিলা মনে হয়েছে। তিনি মোটেই সে রকম নন। আমার বাবা মাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন—আমার মা গলাটিপে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এতে আমার শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে রেখে আমার চিকিৎসা করাতে হয়। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার বয়স চার। চার বছরের স্মৃতি শিশুর মনে থাকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

স্যার, আপনি অনেকক্ষণ একনাগাড়ে আমার লেখা পড়লেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। বাকিটা কাল পড়বেন।

৯

মিসির আলি মুশফেকুর রহমানের খাতা নিয়ে বসেছেন। এখন পড়ছেন শৈশব স্মৃতি। খুবই গোছানো লেখা। একটিও বানান ভুল নেই। কাটাকুটি নেই। বোঝাই যাচ্ছে এই অংশ অনেকদিন আগে লেখা। কাগজ পুরোনো হয়ে গেছে। লেখার কালি বিবর্ণ। তবে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

কিছু কিছু জায়গা নতুন লেখা হয়েছে। সেগুলো পেনসিলে লেখা এবং তারিখ দেওয়া।

"মানুষের অনেক বৈচিত্র্যময় ছেলেবেলা থাকে। ম্যাক্সিম গোর্কির ছেলেবেলা কেটেছে তাঁর দাদিমার সঙ্গে পথে পথে ভিক্ষা করে। আমার ছেলেবেলার শুরুটা ছিল সরল ঘটনাবিহীন।

আমি ছিলাম সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন। বিরাট কম্পাউন্ডের বাড়ি। জেলখানার দেয়ালের মতো উঁচু দেয়াল। খেলার জন্যে অনেক জায়গা, তবুও আমাকে বন্দি থাকতে হত আমার নিজের ঘরে। বারান্দায় বা উঠোনে কিংবা বাড়ির পেছনে খেলতে গেলেই দোতলা থেকে আমার বাবা দেখে ফেলতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, ভেতরে যাও, ভেতরে যাও। আমি দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যেতাম।

নিঃসঙ্গ শিশু নিজের খেলার সঙ্গী নিজেই তৈরি করে নেয়। আমার অনেক কাল্পনিক সঙ্গী–সাথী ছিল। এদের সঙ্গেই খেলতাম। গল্প করতাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল খাটের নিচের অন্ধকার কোণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি খাটের নিচে বসে কাটিয়েছি। মাঝে মাঝে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম।

আমাকে দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সর্দার চাচার। আপনাকে আগেই তাঁর কথা বলেছি। তিনি সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখতেন। বাড়িতে সর্দার চাচা ছাড়াও আরো কিছু মানুষজন ছিল, মালি ছিল। দারোয়ান ছিল। রান্নার লোক ছিল। তাদের কেউ আমার কাছে আসতে পারত না। সর্দার চাচা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠতেন।

বাবা সর্দার চাচাকে খানিকটা সমীহ করতেন। মাঝে মাঝে সর্দার চাচা আমাকে বাগানে খেলার জন্যে নিয়ে যেতেন। কুয়োতলায় নিয়ে যেতেন ছবি আঁকার জন্যে। দোতলা থেকে বাবা আমাকে দেখতে পেতেন, কিন্তু ভেতরে যাও ভেতরে যাও বলে চেঁচাতেন না।

যে জন্ম থেকেই নিঃসঙ্গ সে নিঃসঙ্গতার কষ্ট জানে না। আমিও জানতাম না। মার জন্যে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি আমার ভেতর কোনো সুখস্মৃতি তৈরি করে যেতে পারেন নি। মার কথা মনে হলেই ভয়ংকর এক স্মৃতি ধক করে মনে হত। পরিষ্কার দেখতে পেতাম মা আমার গলা চেপে ধরে আছেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ছোট্ট বুক ধক করে ফেটে যাবে। এই অবস্থা থেকে আমার বাবা উদ্ধার করেন। তিনিই আমাকে কোলে নিয়ে দৌড়ে ডাক্তারের কাছে যান।

আমি যে কদিন হাসপাতালে ছিলাম, সে কদিন আমার বাবা আমার পাশেই ছিলেন। যতবার আমি চোখ মেলেছি ততবারই আমি দেখেছি বাবা ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাসপাতালের ঐ কটি দিনই ছিল আমার শৈশবের শ্রেষ্ঠতম সময়।

পারিবারিক অবস্থার কথা বলি—আমরা কয়েক পুরুষের বনেদি ধনী। মুসলমানরা তিন পুরুষের বেশি তাঁদের ধন ধরে রাখতে পারে না। আমার বাবা হলেন তৃতীয় পুরুষ। যৌবনে তিনি ব্যবসাপাতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। বেশিরভাগ ব্যবসাই বিক্রি করে নগদ টাকা করলেন। টাকা ব্যাংকে জমা করলেন। কয়েকটা বড় বড় বাড়ি কিনলেন। শহরে জমি কিনলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এইসব জমি হীরের দামে বিক্রি হবে।

আমার বাবাও আমার মতোই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না। আমি আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনকে এ বাড়িতে আসতে দেখি নি। আত্মীয়দের

বাড়িতে বাবার যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাবা খানিকটা অসুস্থও ছিলেন। আপনাকে হয়তো ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে—উনি শব্দ সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ শুনলেই তাঁর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হত। তা ছাড়া তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল সবাই তাকে খুন করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। চার দেয়ালের বাইরে বের হলেই তাঁকে খুন করা হবে। তিনি ঘরের বাইরে বের হওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। দুদিন পরপর দারোয়ান বদলাতেন, মালি বদলাতেন। একসময় কুকুর পুষতে শুরু করলেন। প্রথমে এল সরাইলের দুটি কুকুর। গ্রে হাউন্ড জাতীয় কুকুর—ভয়ংকর রাগী। মালি এবং দারোয়ানের সংখ্যা কমতে লাগল, কুকুরের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

বাবার সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না তবে কালেভদ্রে তিনি আমাকে তাঁর দোতলার ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন। সর্দার চাচা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাবা আমার সঙ্গে কথা বলতেন নিচু গলায় এবং কিছুটা আদুরে স্বরে; তবে কখনো আমার দিকে তাকাতেন না। কথাবার্তার একটা নমুনা দিচ্ছি :

বাবা বললেন, কেমন আছিস?

আমি বললাম, ভালো।

'বোস।'

আমি কোথায় বসব বুঝতে পারছি না। ঘরে একটা মাত্র খাট। সেখানে বসার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ বাবা বসে আছেন। তা ছাড়া খাটের এক মাথায় দোনলা বন্দুক। বাবা সব সময় গুলিভরা বন্দুক মাথার কাছে রাখতেন। আমি ইতস্তত করছি—বাবা খাটের এক অংশ দেখিয়ে বসার জন্যে ইশারা করলেন। আমি বসলাম।

'পড়াশোনা হচ্ছে?'

'জি।'

'বাড়িতে মাস্টার আসে?'

'জি।'

(সেই সময় আমার জন্যে প্রাইভেট মাস্টার রাখা হয়েছে। তিনি বাসায় এসে আমাকে পড়িয়ে যান। তাঁর কথা আপনাকে বলেছি। এবং টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে।)

'মাস্টারটা কেমন?'

'ভালো।'

'মোটেই ভালো না। অতি বদলোক। সাবধানে থাকবি। বদ মতলবে ঢুকেছে। খুনখারাবি করবে।'

এটা হচ্ছে বাবার সাধারণ কথার একটি। পৃথিবীর সব মানুষই তাঁর কাছে বদমানুষ। পৃথিবীর সবাই খুনখারাবির মতলব নিয়ে ঘুরছে। আমি বাবার কথার কোনো জবাব দিলাম না। মাথা নিচু করে শুনে গেলাম।

বাবা বললেন, তোকে সাবধান করার জন্যেই ডেকেছি। খুব সাবধান থাকবি। খুব সাবধান।

'জি আচ্ছা।'

'তোর মাস্টারের দরকারই বা কী? নিজে নিজে পড়তে পারবি না?'

'আপনি বললে পারব।'

'এই ভালো। নিজে নিজে পড়। আর তোর যদি পড়াশোনা না হয় তা হলেও ক্ষতি নেই। টাকাপয়সা আমি যা রেখে যাব দুহাতে খরচ করেও শেষ করতে পারবি না। আমার মৃত্যুর পর দুহাতে খরচ করবি। জায়গাজমি সব বিক্রি করে দিবি। তোর কোনো টাকাপয়সা জমিয়ে রাখার দরকার নাই। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'আচ্ছা যা। আমি সর্দারকে বলে দেব সে যেন মাস্টারকে আসতে নিষেধ করে।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—রাতে-বিরাতে দরজা খুলে বের হবি না। কুকুরগুলো ভয়ংকর—এরা তোকে খেয়ে ফেলবে।'

কুকুরগুলো ছিল সত্যি ভয়ংকর। রাতে যতবার ঘুম ভাঙত, শুনতাম, এরা চাপা গর্জন করছে। একটা কুকুর রোজ রাতে আমার দরজা আঁচড়াত। রাতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুমুতে পারতাম না।

'আমি কি এখন চলে যাব?'

'আচ্ছা যা।'

বাবা বালিশ উঁচু করে বালিশের নিচ থেকে চকচকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—বাদাম কিনে খাস।

যতবার বাবার কাছে গিয়েছি ততবারই বাদাম কিনে খাবার জন্যে একটা করে চকচকে দশ টাকার নোট পেয়েছি। বাদাম অবিশ্যি খাওয়া হয় নি। আমাকে দোকানে নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। টাকাগুলো আমি একটা কৌটায় জমা করে রেখেছি। যতবার টাকাগুলো দেখি ততবারই ভালো লাগে।

বাবার হুকুমে সর্দার চাচা মাস্টার সাহেবকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেন। তারপরও তিনি মাঝে মধ্যে আসতেন। অনেকক্ষণ থাকতেন। এর মধ্যে একদিন এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিলেন। সেই চিঠি আমার মার লেখা। মা আমার সঙ্গে দুটা কথা বলতে চান। আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারব?

আমি মাস্টার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিন বাড়ি থেকে বের হলাম। ধরা পড়লাম সর্দার চাচার হাতে। বাকি ঘটনা আপনি জানেন। ঐ অংশটি দ্বিতীয়বার বলতে চাই না। যে কথাটা আপনাকে আগে বলা হয় নি তা হচ্ছে—ঐ চিঠি আমার মার লেখা ছিল না। ঐ চিঠি মাস্টার সাহেবের লেখা।

মিসির আলি লক্ষ করলেন শেষ পাতাটি দুদিন আগে লেখা হয়েছে। এবং প্রচুর কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মুশফেকুর রহমান বুঝতে পারছে না—কী লিখবে। বাংলা ভাষাটাও মনে হচ্ছে ভাব প্রকাশের জন্যে সে উপযুক্ত মনে করছে না। কারণ শেষ পাতাটা ইংরেজিতে লেখা। শেষ পাতার বক্তব্য হল—আমি ভয় পাচ্ছি, বাবা সম্পর্কে আমি আমার মনের ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারি নি। আমি তাঁকে অসম্ভব ভালবাসি।

১০

মিসির আলি তৃতীয় চ্যাপ্টার পড়ছেন। এই অংশটি নতুন লেখা হয়েছে। তারিখ দেখে মিসির আলি বুঝতে পারছেন—পার্কে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর—এই লেখা শেষ করা হয়েছে। পুরা লেখাটা ইংরেজিতে লেখা। শিরোনাম—I and We. বাংলা করলে হয়তো হবে—আমি এবং আমরা।

আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে আমি ভীতু? একজন মানুষকে দেখেই বলে দেওয়া সম্ভব না—সে সাহসী না ভীতু। তা ছাড়া একজন ভীতু মানুষকেও ক্ষেত্রবিশেষে খুব সাহসী হতে দেখা যায়।

আমি ভীতু না। কখনোই ছিলাম না। বাবাকে ভয় করতাম, বাবার কুকুরগুলোকে ভয় করতাম। বাবা যে বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে দোতলায় বের হতেন সেই বন্দুকটাকে ভয় করতাম। আমার ভয় এই তিনটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ও না, আরেকটি ভয়ের ব্যাপার আমার মধ্যে ছিল। আমাদের পুরো বাড়ি মাঝে মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র শব্দ করে নড়ে উঠত। সর্দার চাচা বলতেন, বাড়ি মাঝে মধ্যে কাঁদে, হাসে। এতে ভয়ের কিছু নাই।

অন্ধকারকে ভয় পাওয়া আমার মধ্যে ছিল না। পুরোনো ঢাকায় প্রায়ই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। হয়তো রাতে একা ঘরে বসে আছি—হঠাৎ পুরো অঞ্চলের কারেন্ট চলে গেল। গাঢ় অন্ধকারে আমি একা বসে আছি। নিজের হাতও দেখা যাচ্ছে না—এই অবস্থাতেও আমি কখনো ভয় পাই নি।

ভূতপ্রেতে ভয় পাওয়ার ব্যাপারও আমার মধ্যে ছিল না। কারণ ভয়ের গল্প আমাকে কেউ শোনায় নি। কেউ আমাকে বলে নি ঘরের কোনায় বাস করে কোণী ভূত। খাটের নিচে উবু হয়ে বসে থাকে কন্দকাটা। গভীর রাতে সে তার সরু বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত খাটের নিচ থেকে বের করে শুয়ে থাকা মানুষটাকে ছুঁয়ে দেখতে চেষ্টা করে। শিশুরা সচরাচর যেসব কারণে ভয়ে কাতর হয়ে থাকে সেসব আমার ছিল না। তা ছাড়া অল্পবয়সেই যুক্তি ব্যবহার করতে শিখি। ভয়কে পরাজিত করতে যুক্তির মতো বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে? ধরুন—গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল।

আমি শুনলাম, বাথরুমে খটখট শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হাঁটছে। আতঙ্কে অস্থির না হয়ে আমি যুক্তি দাঁড় করলাম নিশ্চয় নিশ্চয়ই ইঁদুর। কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম। ইঁদুরের কিচকিচ শব্দ শোনা গেল। যুক্তির ওপর নির্ভর করার ফল হাতে হাতে পেলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে গেলাম। ভয়ে অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করলাম না। চেঁচামেচি করে অবিশ্যি কোনো লাভও হত না। দশ বছর বয়স হবার পরই আমি থাকতাম একা। সর্দার চাচা থাকতেন গেটের কাছে। দারোয়ান এবং মালিদের জন্যে যে ঘরগুলো আছে—তার একটিতে।

মাস্টার সাহেবের মৃত্যুর প্রায় মাস দুই পরের ঘটনা। খাওয়াদাওয়া করে ঘুমুতে গেছি। সর্দার চাচা বললেন, ছিটকিনি লাগাও।

আমি ছিটকিনি লাগালাম। সর্দার চাচা তাঁর অভ্যাসমতো বললেন, ভালো কইরা দেখ ঠিকমতো লাগছে কি না।

আমি আরেকবার দেখলাম। ঠিকমতোই লেগেছে।

'এখন বাতি নিভাও। বাতি নিভাইয়া ঘুমাও।'

আমি বাতি নিভিয়ে চারদিক অন্ধকার করে ঘুমুতে গেলাম। আপনাকে বলা হয় নি, আমার বাবা শব্দ যেমন সহ্য করতে পারতেন না, তেমনি আলোও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর ধারণা, আলোতে কুকুর ভালো দেখতে পায় না। অন্ধকারে ভালো দেখে। কাজেই রাত এগারোটার পর এ বাড়ির সব বাতি নেভানো থাকতে হবে। একটি বাতিও জ্বলবে না।

রাত এগারোটা হয়েছে। সব বাতি নিভে গেছে। আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। আমার বালিশের কাছে দু ব্যাটারির একটা টর্চ লাইট। অন্য সময় বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুম এসে যায়। আজ ঘুম আসছে না। জেগে আছি। হঠাৎ পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল। বিচিত্র শব্দ হল। বাড়ি কেঁদে উঠল কিংবা হেসে উঠল। বুকের ভেতর ধক করে উঠল। আর তখন লক্ষ করলাম কুকুরগুলো একে একে আমার ঘরের দরজার বাইরে জড়ো হচ্ছে। এরা চাপা গর্জন করছে। দরজা আঁচড়াচ্ছে। এরা এরকম করছে কেন?

আমার মনে হল খাটের নিচে কী যেন নড়ে উঠল। কেউ যেন নিশ্বাস ফেলল। আমি টর্চ লাইট জ্বালিয়ে খাট থেকে নেমে এলাম। বসলাম খাটের পাশে—টর্চ লাইট ধরলাম।

প্রথমে দেখলাম দুটা চকচকে চোখ। পশুদের চোখে হঠাৎ আলো ফেললে যেমন চকচক করতে থাকে। এই চোখ দুটিও ঠিক সেরকমই চকচক করছে। তারপর মানুষটাকে দেখলাম। নগ্ন একজন মানুষ। খাটের নিচে কুঁজো হয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। যেন টর্চ ফেলে তাকে দেখায় সে আনন্দিত।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, কে?

লোকটা জবাব দিল না। নিঃশব্দে হাসল। তখনই আমি তাকে চিনলাম। আমার প্রাইভেট স্যার।

তখনো আমার এই বোধ হয় নি যে আমি ভয়ংকর একটি দৃশ্য দেখছি। যাকে দেখছি সে মানুষটি জীবিত নয়—মৃত। একজন মৃত মানুষ খাটের নিচে কুঁজো হয়ে বসে থাকতে পারে না। আমি একটি ভয়াবহ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখছি।

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে পড়লাম। যেন কিছুই হয় নি। বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। টর্চের আলো নিভিয়ে দিলাম। আর তখনই সীমাহীন ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করল। এই ভয়ের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। এ ভয়ের জন্ম পৃথিবীতে নয়—অন্য কোথাও।

তীব্র ভয়ের পরপরই একধরনের অবসাদ আছে। ভয়ংকর সত্যকে সহজভাবে নিতে ইচ্ছা করে। ফাঁসির আসামি মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর আতঙ্কে অস্থির হয়। সেই আতঙ্ক দ্রুত কমে যায়। মৃত্যুর ক্ষণ যখন উপস্থিত হয় তখন সে সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যায় ফাঁসির মঞ্চের দিকে। এমন কোনো ফাঁসির আসামির কথা জানা নেই—যাকে কোলে করে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে হয়েছে।

আমি মাস্টার সাহেবকে গ্রহণ করলাম সহজ সত্য হিসেবে। এ ছাড়া আমার উপায়ও ছিল না। মাস্টার সাহেব বাস করতে শুরু করলেন আমার খাটের নিচে। দিনের বেলা

For More Book Download Go To www.missabook.com

কখনো তাঁকে দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলা না। রাতে শোবার সময় খাটের নিচে তাকাই। তখনো কেউ নেই। শুধু গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই তীব্র তামাকের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি খাটের নিচে তিনি আছেন। কুকুরগুলো দরজা আঁচড়াতে থাকে। তিনি কিছু কিছু কথাও বলেন। এবং আশ্চর্যের কথা—আমি জবাব দেই। যেমন—

'তুমি জেগেছ?'

'হুঁ।'

'কটা বাজে?'

'জানি না।'

'ভয় লাগছে?'

'না।'

'পড়াশোনা হচ্ছে ঠিকমতো?'

'হচ্ছে।'

'তোমার সর্দার চাচাকে আমার কথা বলেছ?'

'না।'

'কাউকেই বল নি?'

'না।'

'ইচ্ছে করলে বলতে পার। অসুবিধা নেই।'

'ইচ্ছে করে না।'

'আমি কেন তোমার খাটের নিচে থাকি জান?'

'না।'

'জানতে চাও?'

'না।'

'জানতে না চাইলে জানতে হবে না। সবকিছু জানতে চাওয়া ভালো না। না জানার মধ্যেও আনন্দ আছে। আছে না?'

'জি আছে।'

'ইংরেজি একটা প্রবাদ আছে। তোমাকে একবার পড়িয়েছিলাম। মনে আছে?'

'আছে।'

'বল তো দেখি।'

'মনে পড়ছে না।'

'মনে করার চেষ্টা কর। ইংরেজি বেশি বেশি করে পড়বে। অর্থের মানে বুঝতে না পারলে ডিকশনারি দেখবে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ—কাজেই আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আমি তোমাকে সাহায্য করব। পরামর্শ দেব।'

'আচ্ছা।'

'আমার সম্বন্ধে তোমার কি কিছু জানতে ইচ্ছে করে?'

'না।'

‘জানতে ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস কর। আমি বলব। আমি এমন সব বিষয় জানি যা জীবিত মানুষ জানে না।’

‘আমি কিছু জানতে চাই না।’

‘ঘুম পাচ্ছে?’

‘হুঁ।’

‘ঘুমিয়ে পড়। মশারি ঠিকমতো গোঁজা হয়েছে?’

‘হুঁ।’

‘বড্ড মশা। তুমি ঘুমাও। টর্চ লাইটটা কি হাতের কাছে আছে?’

‘আছে।’

‘একবার জ্বালিয়ে দেখে নাও ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা।’

‘ঠিক আছে।’

‘তোমার সর্দার চাচাকে বলে আরেক জোড়া ব্যাটারি এনে রাখবে।’

‘জি আচ্ছা।’

‘ঘুমিয়ে পড়।’

‘জি আচ্ছা।’

‘গায়ে চাদর দিয়েছ কেন? চাদর সরিয়ে ফেল। গরমে চাদর-গায়ে ঘুমুলে গায়ে ঘামাচি হবে।’

আমি চাদর সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার ঘুম ভাঙে। তীব্র তামাকের গন্ধ পাই। আমার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন। ভরাট গলায় বলেন, ঘুম ভেঙেছে?

‘হুঁ।’

‘অসহ্য গরম পড়েছে। ঘন ঘন ঘুম ভাঙারই কথা। পানির পিপাসা হয়েছে?’

‘না।’

‘বাথরুমে যাবে?’

‘না।’

‘গল্প শুনতে চাও?’

‘না।’

‘আমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তা করছি। এই সংসারে তুমি খুব শিগগিরই একা হয়ে যাবে। তোমার বাবা বেশিদিন বাঁচবেন না। সর্দার চাচাও থাকবেন না। তুমি হবে একা। বুঝতে পারছ?’

‘পারছি।’

‘তোমরা বাবা যে মারা যাবেন এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?’

‘হচ্ছে।’

‘কষ্ট হওয়ারই কথা। তবে মৃত্যু তাঁর জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কিছু মানুষের জন্যে মৃত্যু মঙ্গলময়। উনি অসুস্থ। অসুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে। উনার যে অসুখ সেটা আরো বেড়ে গেলে—চারদিকে বিকট সব জিনিস দেখতে পান। সেই সব ভয়ংকর জিনিস দেখার কষ্ট মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও শতগুণে বেশি। মৃত্যু-যন্ত্রণা একবার হয়। কিন্তু এই

যন্ত্রণা হতেই থাকে। শেষ হয় না। ধাপে ধাপে বাড়ে। তোমার মনে হয় না মৃত্যু তাঁর জন্যে ভালো?'

'জি মনে হয়।'

'তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের সামান্য হলেও সাহায্য করা উচিত বলে আমি মনে করি। সাহায্য করা উচিত না?'

'জি উচিত।'

'কীভাবে সাহায্য করা যায় তুমি বল তো?'

'আমি জানি না।'

'আমার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। আমি ছায়া মাত্র। আমি শুধু বুদ্ধি দিতে পারি। কিছু করতে পারি না। তবে আমার ক্ষমতা বাড়ছে। ছায়া জগতের ছায়াদের ক্ষমতা বাড়ে এবং কমে। যতই তুমি আমার ওপর বিশ্বাস করবে ততই আমার ক্ষমতা বাড়বে। তোমার সর্দার চাচা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে তা হলে আমার ক্ষমতা অনেকগুণে বেড়ে যাবে। তখন আমি ছোটখাটো কাজ করতে পারব। তুমি কি মনে কর না আমার ক্ষমতা বাড়া উচিত?'

'মনে করি।'

'বুঝেছ তন্ময়, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার ক্ষতির চেষ্টা কখনো করব না। প্রচুর ক্ষমতা হবার পরও করব না। এখন ঘুমাও।'

'আচ্ছা।'

'ঘুম কি আসছে না?'

'না।'

'তা হলে এস আরো কিছুক্ষণ গল্প করি। তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে ভাবি।'

'ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'ভাবলে কোনো দোষ নেই। ভাবলেই যে করতে হবে তা তো না। আমরা কত কিছু ভাবি। ভাবলেই যে করতে হবে তা তো না। আমরা সব সময় যা ভাবি তা কি করি?'

'না।'

'বেশ এস, তা হলে ভাবি। তুমি কি কলা খাও তন্ময়?'

'খাই।'

'রাতে শোবার আগে এই কলার খোসাগুলো তুমি নিশ্চয়ই দোতলার সিঁড়ির মাথায় রেখে আসতে পার। পার না?'

'হুঁ।'

'এটা তো তেমন কোনো অন্যায় না। ঝুড়িতে না ফেলে সিঁড়ির মাথায় ফেলেছ। মনের ভুলেও তো ফেলতে পারতে। পারতে না?'

'হুঁ।'

'তোমার বাবা তো রাতে বারান্দায় হাঁটেন। অন্ধকার বারান্দা। মনের ভুলে তিনি কলার খোসায় পা ফেলতে পারেন। পারেন না?'

'হুঁ, পারেন।'

'কলার খোসায় পা পড়লে অনেক কিছুই হতে পারে। তিনি সামান্য হোঁচট খেতে পারেন। বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে পারেন। আবার সিঁড়ির একেবারে নিচে পড়ে যেতে পারেন। পারেন না?'

'হুঁ, পারেন।'

'কোনটা ঘটবে আমরা জানি না। কবে ঘটবে তাও জানি না। প্রথম দিনেই যে ঘটবে তা তো না। প্রথম দিনে কিছু নাও ঘটতে পারে। দিনের পর দিন হয়তো আমাদের কলার খোসা রাখতে হবে। পারবে না? কথা বলছ না কেন? পারবে না?'

'পারব।'

'বাহ্ ভালো। ভেরি গুড। এখন ঘুমাও। আরাম করে ঘুমাও। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। ঘুম ভালো হবে।'

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার বাবা মারা গেলেন কলার খোসায় পা হড়কে। তিনি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যান। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পান। দুদিন হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় থেকে তৃতীয় দিনের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর জ্ঞান ফেরে। তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন—আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে কে দেখবে?

বাবার মৃত্যুর পর অনেকদিন আমার খাটের নিচে কেউ ছিল না। কতদিন তা বলতে পারব না। আমি এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থার ভেতর ছিলাম। সময়ের হিসাব ছিল না। সারা দিন কুয়াতলায় ছবি আঁকতাম। সর্দার চাচা কুয়ার উপর বসে বিষণ্ন চোখে আমার ছবি আঁকা দেখতেন। একসময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, সৌন্দর্য হইছে। এখন ধুইয়া ফেলি।

আমার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘদিন পর আমার মা উপস্থিত হলেন। সর্দার চাচা কঠিন গলায় তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি শুনলাম তিনি আমার মাকে বলছেন—খবরদার, এই দিকে পাও বাড়াইবেন না। পাও বাড়াইলে কুত্তা দিয়া খাওয়াইয়া দিমু।

বাবা কাগজপত্রে আমার জন্যে অভিভাবক নিযুক্ত করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি হলেন বাবার ম্যানেজার—ইসমাইল চাচা। পৃথিবীতে কঠিন মানুষ যে কজনকে আমি চিনি তিনি তাঁর একজন। তিনি কাজ ছাড়া অন্য কিছু কখনো ভালবেসেছেন বলে আমি জানি না। বাবার মৃত্যুর পর একদিন আমাদের এ বাড়িতে তিনি এলেন। আমাকে একটিও সান্ত্বনার কথা বললেন না। যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, তুমি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না। স্কুলে যাওয়া শুরু কর। পড়াশোনা কর। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। সেই চিন্তা আমি করব। তোমার মা, তোমার অভিভাবকত্বের জন্যে কোর্টে মামলা করেছেন। মামলায় লাভ হবে না। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে ছোটবেলায় তিনি তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তার পরেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি—তুমি কি চাও তোমার মা তোমার অভিভাবক হোক?

আমি বললাম, না।

'বেশ। আমি তা হলে যাই। কোর্টে তোমাকে যেতে হতে পারে। তবে আমার ধারণা, তোমার মা মামলা তুলে নিবেন। উনাকে মোটা টাকার লোভ দেখানো

হয়েছে। সেই লোভ তিনি সামলাতে পারবেন না। তুমি কি টাকার পরিমাণ জানতে চাও?'

আমি বললাম, না।

'সেই ভালো। টাকাপয়সা থেকে দূরে থাকাই ভালো। তোমার বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দায়িত্ব আমি পালন করব। বাকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।'

যখন সব মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি খাটের নিচে আর কখনোই কাউকে দেখব না। আমার ভেতর এক ধরনের অসুখ তৈরি হয়েছিল, অসুখ সেরে গেছে তখনই এক রাতে খাটের নিচ থেকে তীব্র তামাকের গন্ধ পেলাম। আমি ফিসফিস করে বললাম, কে?

মাস্টার সাহেবের শ্লেষ্মাজড়িত ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—আমি তন্ময়, আমি। তুমি কেমন আছ?

'ভালো।'

'আমি বুঝতে পারছি—ভালো আছ। ভালো আছ বলেই তোমাকে বিরক্ত করছি না। আমি কেমন আছি তা তো জিজ্ঞেস করলে না। জিজ্ঞেস কর।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'আনন্দে আছি। আমার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। ছায়াজগতের এই এক মজা। ক্ষমতা যখন বাড়ে দ্রুত বাড়ে। আমি এখন তোমার বাবার দোতলার ঘরটায় থাকি। আরামে থাকি। নির্জনতা ভালো লাগে। একা থাকার মজাই অন্য রকম। মাঝে মাঝে তোমার বাবার টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোন রিসিভার তুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে। বলতে পারি না। এত ক্ষমতা আমার এখনো হয় নি। তবে দেরি নেই, হবে। খুব শিগগিরই হবে। তন্ময়!'

'জি।'

'তুমি একবার আমাকে সাহায্য করেছ—আরেকবার একটু সাহায্য করবে না? সামান্য সাহায্য। তা হলে তোমার সঙ্গে আমি একটা চুক্তিতে যাব। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি তোমার মতো থাকবে। আমি থাকব আমার মতো। আর সাহায্য যদি না কর তা হলে বাধ্য হয়ে তোমাকে বিরক্ত করতে হবে। তুমি কি চাও আমি তোমাকে বিরক্ত করি?'

'না।'

'তা হলে তুমি সাহায্য কর। কাজটা খুব সহজ। তুমি যখন কুয়োতলায় ছবি আঁক, তখন তোমার সর্দার চাচা কুয়ার পাড়ে বসে থাকেন। থাকেন না?'

'হুঁ।'

'বসে বসে ঝিমাতে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁর চোখও বন্ধ হয়ে যায়। যায় না?'

'হ্যাঁ যায়।'

'এই সময় সামান্য ধাক্কা দিলেই কিন্তু উনি কুয়ার ভেতর পড়ে যাবেন। অনেক দিনের পুরোনো কুয়া। বিষাক্ত গ্যাস জমে আছে—একবার কুয়ার ভেতর পড়ে গেলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। পারবে না?'

'না।'

'দেখ তন্ময়, এটা না পারলে কী করে হবে? না পারলে আমি তোমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে থাকব। রাতে ঘুম ভাঙলে দেখবে আমি তোমার পাশেই নগ্ন হয়ে শুয়ে আছি। সেটা কি তোমার ভালো লাগবে?'

'না।'

'তা হলে আমি যা বলছি তাই তুমি করবে। ঠিক না তন্ময়?'

'হ্যাঁ।'

'গুড বয়। ভেরি গুড বয়।'

তার দুদিন পরই কুয়ার ভেতর পড়ে সর্দার চাচা মারা যান। বাবার ম্যানেজার ইসমাইল চাচা তখন থাকতে আসেন আমার সঙ্গে। তিনি তাঁর মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন।

ইসমাইল চাচা বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে—মেয়েটির নাম রানু। তিনি রানুকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে উঠে এলেন। দুটা ঠেলাগাড়িতে করে তাঁদের মালপত্র চলে এল। বাড়ির এক অংশের পরপর তিনটি ঘর তিনি বেছে নিলেন। একটি তাঁর শোবার ঘর। একটি বসার। একটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। যে ব্যবস্থাগুলো তিনি করছেন সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বললেন না। তিনি বাড়িতে এসে উঠলেন, সকাল দশটার দিকে, দুপুরের মধ্যে বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন হল। যেমন তিনি সব কটি কুকুর বিদেয় করে দিলেন। তিনি বললেন, কুকুরের দরকার নেই। কুকুর দেখলে ভয় লাগে। বাড়ির পেছনের কুয়া বন্ধ করে দিলেন। কয়েক ট্রাক মাটি চলে এল। সন্ধ্যার মধ্যে কুয়া বুজিয়ে দেওয়া হল। সন্ধ্যার পর এই বাড়ির বাইরের বাতিগুলো আবার জ্বলল। তিনি অনেকক্ষণ একা একা মোড়া পেতে বাগানে রইলেন।

আমার সঙ্গে কথা হল রাতে ভাত খাবার সময়। আমাকে বললেন, তোমার নাবালক অবস্থায় আমি তোমার অভিভাবক। কাজেই তোমার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে যা ভালো মনে করি তা করব। তোমার যেদিন আঠারো বছর বয়স হবে সেদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। নারায়ণগঞ্জে আমার একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠব। আমি বললাম, জি আচ্ছা।

তিনি বললেন, রানুকে আমি নিয়ে এসেছি, তোমার একজন কথা বলার লোক হল। তোমার কোনো কথা যদি আমাকে সরাসরি বলতে ইচ্ছা না করে—রানুকে বললেই আমি শুনব।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

'শীত এসে যাচ্ছে—বাড়ির চারদিকে এত খালি জায়গা আমি চাই তুমি ফুলের বাগান কর। কীভাবে মাটি তৈরি করতে হয়। কীভাবে বীজ পুঁততে হয়—রানু তোমাকে দেখিয়ে দেবে। ও জানে। নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে আমাদের খুব সুন্দর ফুলের বাগান ছিল।'

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

রানু হেসে ফেলে বলল, বাবা এই ছেলেটা জি আচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। তুমি যাই বলবে, সে বলবে—জি আচ্ছা। তুমি যদি তাকে বল, তুমি সকালে উঠে

তোমার মাথাটা কামিয়ে ফেলবে, তা হলে সে বলবে, জি আচ্ছা। ইসমাইল সাহেব বললেন, মা রানু এই ছেলে এখন থেকে তোমার ভাই। বোনরা ভাইকে যেভাবে আগলে রাখে তুমি তাকে সেইভাবে আগলে রাখবে।

রানু অবিকল আমার গলার স্বর নকল করে বলল, "জি আচ্ছা।" ইসমাইল চাচা হাসতে গিয়েও হাসলেন না। কিন্তু আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। এমন প্রাণ খুলে আমি অনেকদিন হাসি নি।

আমার নতুন জীবন শুরু হল। আনন্দময় জীবন। সেই শীতে আমি এবং রানু মিলে সুন্দর বাগান করলাম। কসমস, ডালিয়া, গাঁদা ফুলের গাছ। ইসমাইল চাচা নিজে শুরু করলেন গোলাপের চাষ। তিনি একজন মালি রাখলেন। খুব নাকি এক্সপার্ট মালি, নাম রওশন মিয়া। সেই এক্সপার্ট মালিকে দেখা গেল খুরপি হাতে ঘুরে বেড়ায়। কাছে গেলেই ফুল বিষয়ে একটি গল্প বলে—বুঝলেন ভাইডি আল্লাহতালা তো বেহেশত বানাইলেন—সেই বেহেশতে কিন্তু কোনো ফুল গাছ নাই। তিনি বললেন, আমার বেহেশতে আমি ফুল দেব না। ফুল দিলে ফুল হবে মানুষের চেয়ে সুন্দর। এটা ঠিক না। মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু আমি বেহেশতে রাখব না। বুঝলেন ভাইডি এই জন্যে বেহেশতে ফুল গাছ নাই, ফুল নাই।

রানু বলল, চুপ কর মিথ্যুক।

রওশন কিছু বলতে গেলেই রানু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলত, চুপ কর মিথ্যুক। আমি হো হো করে হাসতাম।

আমি হাসি ভুলে গিয়েছিলাম। হাসি পেলেও কখনো হাসতাম না। সব সময় মনের ভেতর থাকত হাসলেই ওরা আমার কালো জিব দেখে ফেলবে।

রানু নামের এই অদ্ভুত মেয়েটি কখনো আমাকে আমার কালো জিব নিয়ে কিছু বলে নি। ভালবাসা কী আমি আমার জীবনে কখনো বুঝি না। এই কিশোরী ভালবাসার গভীর সমুদ্রে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল। রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার সময় আমি কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে বলতাম—আমি এত সুখী কেন? জীবনের প্রথম অংশ দুঃখে-দুঃখে কেটেছে বলেই কি এই অংশে এত সুখ?

মাস্টার সাহেব নামে একটি বিভীষিকা আমার জীবনে আছে, তা মনে রইল না। শুধু মাঝে মাঝে বাবার দোতলা ঘরের দিকে তাকালে গা কাঁটা দিয়ে উঠত। কখনো ঐ ঘরের কাছে যেতাম না। আমি একা না, অন্য কেউও যেত না। কারণ ইসমাইল চাচা কী জন্যে যেন একবার দোতলায় উঠেছিলেন—ফিরে এসে আমাকে এবং রানুকে বললেন, তোমরা কেউ ওদিকে যাবে না। কখনো না, ভুলেও না।

রানু বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বাবা?

তিনি কঠিন গলায় বললেন—আমি নিষেধ করেছি এই জন্যে। তিনি কাঠের মিস্ত্রি ডাকিয়ে দোতলা ঘরের দুটি দরজাতেই আড়াআড়ি পাল্লা লাগিয়ে দিলেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে কাঁটাতারের গেট করে দিলেন। আমার জীবনের একটি অন্ধকার অংশকে তিনি পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। পুরোপুরি বোধহয় পারলেন না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো খাট থেকে নেমে আসি।

খাটের নিচে টর্চের আলো ফেলি। না কেউ সেখানে নেই। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমুতে যাই।

আমি মেট্রিক পাস করলাম।

খুব ভালোভাবে পাস করলাম। পত্রিকায় আমার নাম ছাপা হল। আইএসসি পরীক্ষায় আরো ভালো ফল করলাম। এবার পত্রিকায় ছবি ছাপা হল। আমার কৌতূহল ছিল মনোবিজ্ঞানে, সায়েন্স ছেড়ে আর্টস নিলাম। ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রানুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সহজ। এই সম্পর্কে কোনো রকম জটিলতা ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে মেশার আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কারো সঙ্গেই আমি কখনো মিশি নি। কাছ থেকে দেখিও নি। এই প্রথম একজনকে দেখলাম। অন্য মেয়েরা কেমন জানি না—এই মেয়েটিকেই জানি। সহজ একটা মেয়ে কিন্তু রহস্যময়।

আমি রাত জেগে পড়ি সে রাত জাগতে পারে না। ঘুম ঘুম চোখে পাশে বসে থাকে। আমি বলি তুমি ঘুমিয়ে পড়। তুমি জেগে আছ কেন?

সে বিস্মিত হয়ে বলে, তাই তো আমি কেন জেগে আছি। আমি ঘুমাতে গেলাম। তুমি কতক্ষণ পড়বে?

'অনেকক্ষণ।'

'রাত একটা, না রাত দুটা?'

'দুটা।'

'আজ একটা, পর্যন্ত পড়লে কেমন হয়?'

'একটা পর্যন্ত পড়লে তোমার কী লাভ?'

'তুমি রাত জেগে পড়। আমার দেখতে কষ্ট হয়।'

'কষ্ট হয় কেন?'

'জানি না কেন হয়। তবে হয়।'

আমি রানুর ভেতর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করতে লাগলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার প্রবণতা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ততক্ষণই সে আমার পাশে থাকবে।

বাড়ির রান্নাবান্না তাকে করতে হয়। রান্না করতে যাবে, কিছুক্ষণ পরপর উঠে আসবে। আমি যদি বলি—কী? সে তৎক্ষণাৎ বলবে, কিছু না।

মাঝে মাঝে সে ভয়াবহ অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যায়। দেখেই মনে হয় তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে ঝড়ের কারণ সে জানে না। আমিও জানি না।

ইসমাইল চাচা তাঁর নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে চলে যাওয়া ঠিক করলেন। রানু বলল, অসম্ভব, আমি যাব না। ও বেচারা একা থাকবে? এত বড় বাড়িতে একা থাকলে ভয় পাবে না? এমনিতেই সে ঘুমের মধ্যে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে কাঁদে। যদি যেতে হয় তাকে নিয়ে যেতে হবে। বাবার সঙ্গে সে চাপা গলায় ঝগড়া করে এবং একসময় আমাকে এসে বলে, তুমি কি চাও আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

আমি বলি, না না। কখনো চাই না।

'তুমি চাইলেও আমি যাব না। তুমি কখনো, কোনোভাবেই এ বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াতে পারবে না।'

'কী আশ্চর্য! তাড়ানোর প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আমি জানি না কেন আসছে। মাঝে মাঝে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। আমি কী করি না করি নিজেই বুঝি না। সরি। কী সব অদ্ভুত ব্যাপার যে আমার হচ্ছে। তুমি যখন রাত জেগে পড়, আমিও রাত জাগতে চেষ্টা করি। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। বাধ্য হয়ে ঘুমুতে যাই। তখন আর ঘুম আসে না। রাতের পর রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটাই। তুমি কি সেটা জান?'

'না। এখন জানলাম।'

'আমার কী করা উচিত?'

'ঘুমের ওষুধ খাওয়া উচিত।'

'ঘুমের ওষুধ আমার আছে। কিন্তু আমি খাই না। রাত জেগে আমি নানান কথা ভাবি। আমার ভালোই লাগে।'

আমাদের দিনগুলো এই ভাবেই কাটছিল। তারপর একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

তখন আমি এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। বর্ষাকাল। কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ক্লাস থেকে ফিরেছি বিকেলে। গেট দিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় দেখি, রানু এই বৃষ্টির মধ্যে বাগানে দাঁড়িয়ে ভিজছে। কী যে সুন্দর তাকে লাগছে! আমি চেঁচিয়ে বললাম—এই রানু এই!

রানু ছুটে এল। হাসতে হাসতে বলল, এই যে ভাই ভালো ছাত্র—তুমি কি আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজবে? নাকি খারাপ ছাত্রীর সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা নিষেধ?

আমি বললাম, না নিষেধ না—চল বৃষ্টিতে ভিজি।

'অসুখে পড়লে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।'

'না, দোষ দেব না। দাঁড়াও খাতাটা রেখে আসি।'

রানু বলল, না না। খাতা রাখতে যেতে পারবে না। খাতা ছুড়ে ফেলে দাও।

আমি খাতা ছুড়ে ফেললাম। রানু চেঁচিয়ে বলল, স্যান্ডেল খুলে ফেল। আজ আমরা গায়ে কাঁদা মাখব। পানিতে গড়াগড়ি খাব। দেখো বাগানে পানি জমেছে।

আমি স্যান্ডেল ছুড়ে ফেললাম। রানু বলল—আজ বাসায় কেউ নেই। পুরো বাড়িতে শুধু আমরা দু জন।

রানু কথাগুলো কি অন্যভাবে বলল? কেমন যেন শোনাল। যেন সে প্রবল জ্বরের ঘোরে কথা বলছে। কী বলছে সে নিজেও জানে না।

আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে রানু?

রানু থেমে থেমে বলল, আমার কী হয়েছে আমি জানি না। আমার খুব অস্থির অস্থির লাগছে। আমি আজ ভয়ংকর একটা অন্যায় করব। তুমি রাগ করতে পারবে না। আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবতে পারবে না।

রানু ঘোর লাগা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি

আমাকে খারাপ মেয়ে ভাব আর যাই ভাব—আমি এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা অন্যায় করব। প্লিজ চোখ বন্ধ কর। তুমি তাকিয়ে থাকলে অন্যায়টা আমি করতে পারব না।

চোখ বন্ধ করতে গিয়েও চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারছি রানু কী করতে যাচ্ছে। আমি কেন যে কোনো মানুষই তা বুঝবে। আমার নিজেরও যেন কেমন লাগছে। হঠাৎ দোতলার দিকে তাকালাম, আমার সমস্ত শরীর বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি দেখলাম আমার উলঙ্গ মাস্টার সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তিনি কী চান আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম। তিনি আমার সব প্রিয়জনদের একে একে সরিয়ে দিচ্ছেন—প্রথমে বাবা, তারপর সর্দার চাচা। এখন রানু। তা সম্ভব না। কিছুতেই সম্ভব না।

আমি রানুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সে মাটিতে পড়ে গেল।

সে অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে?

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমাকে এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এক্ষুনি। এই মুহূর্তে। যেভাবে আছ সেইভাবে।

রানু কোনো প্রশ্ন করল না। উঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। ইসমাইল চাচা ঢুকলেন তার কিছুক্ষণের মধ্যেই। তিনি বললেন—কী ব্যাপার?

আমি কঠিন গলায় বললাম, চাচা আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

আমি তার জবাব দিলাম না। রানু মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে গেল। তার এক ঘণ্টার ভেতরই বাবা মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

অনেক অনেক দিন পর আমি আবার একা হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর থেকে ঘন হয়ে বৃষ্টি নামল। রীতিমতো ঝড় শুরু হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আমি অন্ধকার বারান্দায় বসে রইলাম। আমার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। জায়গাটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে—সেই আলোয় আমি উলঙ্গ মাস্টার সাহেবকে রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বাতাসের এক একটা ঝাপটা আসছে। সেই ঝাপটায় ভেসে আসছে সিগারেটের কড়া গন্ধ। আবারো সেই গন্ধ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হাসনাহেনার গন্ধে। সেবার আমাদের হাসনাহেনা গাছে প্রথমবারের মতো ফুল ফুটেছিল। মানুষের সঙ্গে গাছের হয়তো কোনো সম্পর্ক আছে। নয়তো কখনো যে গাছে ফুল ফোটে না—হঠাৎ সেখানে কেন ফুল ফুটল?

রাত বাড়তে লাগল। বৃষ্টি বাড়তে লাগল। কামরাঙা গাছের ডাল বাতাসে নড়তে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম দোতলার দিকে। সিঁড়ির মুখ কাঁটাতার দিয়ে বন্ধ। মাস্টার সাহেব বললেন, কাঁটাতারের বেড়া খুলে রেখেছি, তুমি উঠে এস।

আমি উঠে গেলাম। কঠিন গলায় বললাম, আপনি কী চান?

তিনি বললেন, আমি কিছু চাই না তন্ময়। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

'আপনার সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।'

'তুমি তো ভুল কথা বলছ তন্ময়। এখনই আমার সাহায্যের তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে সাহায্য করব। আমি আমার কথা রাখি।'

'আপনি কেউ না। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা।'

'কে বলল তোমাকে?'

'আমি মনোবিদ্যার ছাত্র। আমি জানি। আমি সিজোফ্রেনিয়ার রুগি। সিজোফ্রেনিয়ার রুগিদের হেলুসিনেশন হয়। তারা চোখের সামনে অনেক কিছু দেখতে পায়। আমি তাই দেখছি।'

'তোমাদের ইসমাইল সাহেব কি সিজোফ্রেনিয়ার রুগি?'

'না।'

'তিনি কিন্তু আমাকে দেখেছেন। কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছেন। এ ঘরে তোমাদের আসতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেন নি?'

'হ্যাঁ করেছেন।'

'তোমার বান্ধবী। রানু মেয়েটিও কিন্তু আমাকে দেখেছে। ঘটনাটা তোমাকে বলি। এক দুপুর বেলায় সে হাঁটতে হাঁটতে আমার ঘরের দিকে চলে এল। তাকাল বারান্দার দিকে। আমি তখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নগ্ন অবস্থায় দাঁড়ালাম বলাই বাহুল্য। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে গেল। আমি তখন তাকে কুৎসিত একটা কথা বললাম...বললাম...'

'চুপ করুন।'

'রেগে যাচ্ছ কেন? রেগে যাবার কী আছে—তোমার কথা যদি ঠিক হয় তা হলে আমার অস্তিত্ব নেই। আমি তোমার মনের কল্পনা। কাজেই আমি মেয়েটিকে কী বলেছি তা শুনতে তোমার আপত্তি হবে কেন? আমি মেয়েটিকে,...

'Stop'.

'হা হা হা। মেয়েটি এতই ভয় পেয়েছিল যে নড়তে-চড়তে পারছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এই ফাঁকে আমি কিছু কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করলাম। কে জানে এগুলো হয়তো তার পছন্দ হয়েছে।'

'আমি আপনার পায়ে পড়ছি থামুন।'

'বেশ থামলাম। রানু তোমাকে এই ঘটনার কিছু বলে নি?'

'না।'

'আমার কথায় তোমার যদি সন্দেহ থাকে তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

'জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম।'

'ভেরি গুড। এখন মনোবিজ্ঞানীর ছাত্র; তুমি আমাকে বল, তোমার ইসমাইল চাচা কিংবা তোমার বান্ধবী ওরা সিজোফ্রেনিয়ার রুগি না হয়েও আমাকে দেখছে কী করে? এর ব্যাখ্যা কী?'

'আমি এর ব্যাখ্যা জানি না।'

'শুধু তুমি কেন। কেউই জানি না। এই পৃথিবীতে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন জিনিসের সংখ্যাই বেশি।'

'আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কিন্তু একজন পারবেন।'

‘তাই নাকি! সেই একজনটা কে?’

‘তিনি আমার স্যার। তাঁর নাম মিসির আলি।’

‘নিয়ে এস তোমার স্যারকে।’

‘তাঁকে আনার আমি কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমার সমস্যা আমিই সমাধান করব।’

‘এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই।’

‘হ্যাঁ।’

‘ভালো খুব ভালো। আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি।’

‘আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। আপনি রানুর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।’

‘তুমি অদ্ভুত কথা বলছ তন্ময়। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না আবার তুমি বলছ— আমি রানুর কোনো ক্ষতি করতে পারব না। এরকম করছ কেন?’

‘এরকম করছি কারণ মানুষ একই সঙ্গে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে না।’

‘কে বলেছে, তোমার স্যার?’

‘হ্যাঁ।’

‘ইন্টারেস্টিং মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। উনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবেন আমার অস্তিত্ব নেই। আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব উনার অস্তিত্ব নেই। হা হা হা। কবে তুমি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে?’

‘আনব। তাঁকে আমি আনব। আপনাকে কথা দিতে হবে আপনি রানুর কোনো ক্ষতি করবেন না।’

‘দেখ তন্ময় আমি তোমার স্বার্থ দেখব। তোমার ভালো দেখব। যদি আমার কখনো মনে হয় এই মেয়ের কারণে তোমার ক্ষতি হচ্ছে তখনই আমি তাকে সরিয়ে দেব। এখন আমার অনেক ক্ষমতা। তবে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত যখন নেব, তোমাকে জানিয়েই নেব।’

‘আপনাকে ধন্যবাদ।’

‘যাও ঘুমুতে যাও। সমস্ত দিনে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে। তোমার ঘুম দরকার। রানুর টেবিলের ড্রয়ার ভরতি ঘুমের ওষুধ। তুমি দুটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। শুভ্র রাত্রি। ভালো কথা ঘুমুতে যাবার আগে ভেজা কাপড় বদলে নিও।’

১১

মিসির আলি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। জ্বর সারলেও শরীর খুব দুর্বল। রিকশায় বাসায় আসতে গিয়েই ক্লান্ত হয়েছেন। রীতিমতো হাঁপ ধরে গেছে। বিকেলে এসেছেন। এসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব ক্লান্ত অবস্থায় ঘুম ভালো হয় না। ঘুমের তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তার ওপর বদু কিছুক্ষণ পরপর এসে মাথায় হাত দিয়ে জ্বর এল কিনা দেখে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা সে ডেকে তুলে ফেলল। তার বিখ্যাত দার্শনিক উক্তির একটি শোনাল,

'সইন্ধ্যাকালে ঘুমাইলে আয়ু কমে। সইন্ধ্যাকালে মাইনষের বাড়িতে বাড়িতে আজরাইল উঁকি দেয়। এই জন্যে সইন্ধ্যাকালে জাগনা থাকা লাগে। উঠেন, চা পানি খান।'

আজরাইল এসে তাকে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় না পায় সে জন্যেই মিসির আলি উঠে হাত–মুখ ধুলেন। চা খেলেন। সিগারেট খেতে এখন আর বাধা নেই। ডাক্তার-নার্স ছুটে আসবে এই আশঙ্কা থেকে তিনি মুক্ত, তবু সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে না। পার্কের দিকে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করছে। শরীরে বোধ হয় কুলাবে না।

'বদু।'

'জে স্যার।'

'আমি হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে কেউ আমার খোঁজ করেছিল?'

'জে না। আপনেরে কে খুঁজব?'

'মিসির আলি ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন। তাই তো, কে তাঁকে খুঁজবে? তিনি হালকা গলায় বললেন, I have no friends, nor a toy.

'স্যার রাইতে কী খাইবেন?'

'যা খাওয়াবি তাই খাব।'

'শিং মাছ আনছি। অসুখ অবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।'

'আচ্ছা।'

অতি অখাদ্য শিং মাছের ঝোল দিয়ে মিসির আলিকে রাতের খাবার শেষ করতে হল। রোগীর খাদ্য, এ জন্যেই কোনো রকম মশলা ছাড়া বদু শিং মাছ রান্না করেছে। মিসির আলি বললেন, মুখে দিতে পারছিনাতোরে বদু।

'অসুখ অবস্থায় মুখে রুচি থাকে না।'

'রুচি আসবে কোত্থেকে? তুই তো মাছগুলো শুধু লবণ পানিতে সেদ্ধ করেছিস।'

'এই খাওয়া লাগব স্যার। অসুখ অবস্থায় মশলা হইল বিষ।'

খাওয়ার পর বদু তার পড়া নিয়ে এল। মিসির আলি বললেন, আজ থাক বদু। খুব টায়ার্ড লাগছে। আজ শুয়ে পড়ি।

বদু বলল, দুই মিনিটের মামলা।

বদু মিসির আলিকে চমৎকৃত করল—বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নির্ভুল বলে গেল। মিসির আলি বললেন, ব্যাপার কী?

'শিখলাম।'

'তাই তো দেখছি। শিখলি কীভাবে?'

তন্ময় ভাইজান একবার আইস্যা বলল, "শোন বদি তুমি যদি অক্ষরগুলো শিখে ফেলতে পার তা হলে তোমার স্যার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমার কাণ্ড দেখে খুব খুশি হবেন।"

বদু তন্ময়ের কথাগুলো শুধু যে শুদ্ধ ভাষায় বলল তাই না, তন্ময়ের মতো করেই বলল।

মিসির আলি বললেন, আমি খুশি হয়েছি। শিখলি কীভাবে। কে দেখিয়ে দিয়েছে?

'তন্ময় ভাইজান দেখাইয়া দিছে। রোজ রাইত কইরা একবার আসত। বুঝছেন স্যার, ভালো লোক। আপনার মতোই ভালো। ভালো লোকের কপালে দুঃখু থাকে। এই জন্যেই আফসোস।'

‘তন্ময় কি রোজই আসত?’

‘জি রোজই একবার আসছেন।’

‘আজ আসবে?’

‘জি আসব। বইল্যা গেছে আসব।’

মিসির আলি তন্ময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে এল ঠিক দশটায়। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, স্যার আপনার শরীর এখন কেমন?

মিসির আলি বললেন, খুব খারাপ। শুধু ঘুম পায়। কিন্তু ঠিকমতো ঘুম আসে না।

‘আমি আজ বরং উঠি।’

‘না না। তুমি বস। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।’

‘আপনি কি আমার লেখাগুলো পড়ে শেষ করেছেন?’

‘হ্যাঁ শেষ করেছি। এই নিয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলব।’

‘আজ না হয় থাক স্যার। আপনাকে দেখাচ্ছেও খুব ক্লান্ত।’

ক্লান্ত দেখালেও আমার যা বলার আজই বলতে চাই। এবং তোমার আমাকে যা বলার তা আজই বলা শেষ করবে। ব্যাপারটা তোমার ওপর যেমন চাপ ফেলছে। আমার ওপরও চাপ ফেলছে। তোমার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?’

‘আছে।’

‘চল তা হলে পার্কে চলে যাই। যেখানে গল্পের শুরু হয়েছে, সেখানেই শেষ হোক।’

‘এই ঠাণ্ডায় পার্কে যাবেন?’

‘হুঁ।’

মিসির আলি চাদর গায়ে দিলেন। বদুকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। মিসির আলিকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলেন।

পার্কের বাইরে রাস্তায় আলো আছে। পার্কের ভেতর আলো নেই। মিসির আলি এবং তন্ময় বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছেন। আজ শীত কম। তারপরেও চাদরে সারা শরীর ঢেকে মিসির আলি জবুথবু হয়ে বসে আছেন। মিসির আলির শীত লাগছে। পার্ক পুরোপুরি ফাঁকা। আকাশে চাঁদ আছে তবে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসতে পারছে না। জোছনা খেলছে গাছের পাতায়। মিসির আলি জোছনা দেখছেন।

‘তন্ময়।’

‘জি।’

‘তোমার লেখা আমি মন দিয়ে পড়েছি। খুব মন দিয়ে পড়েছি। আমার মনে হয় না, আমার সাহায্যের তোমার প্রয়োজন আছে। তুমি ঠিক পথেই এগুচ্ছ। একজন মনোবিজ্ঞানীর যেভাবে এগুনো উচিত তুমি সেইভাবেই এগুচ্ছ!’

‘স্যার আমি পারছি না।’

‘আমার তো মনে হয় পারছ। খুব ভালোভাবেই পারছ।’

For More Book Download Go To www.missabook.com

'না, পারছি না। রানু খুব শিগগিরই বিপদে পড়বে। মাস্টার সাহেব তাঁকে সরিয়ে দেবেন। রানু একটি চিঠি পেয়েছে। তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তাঁকে কোনো চিঠি লিখি নি, চিঠি পাঠিয়েছেন মাস্টার সাহেব।'

মিসির আলি বললেন, মাস্টার সাহেব বলে কেউ নেই। তুমি তা খুব ভালো করে জান। জান না?

তন্ময় চুপ করে রইল।

'তোমার মনে কি সন্দেহ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনি একসময় বলেছেন সব প্রশ্নের দুটি উত্তর—হ্যাঁ এবং না। মাস্টার সাহেব বলে কি কিছু আছে? এই প্রশ্নেরও দুটি উত্তর হবে—হ্যাঁ এবং না।'

'তুমি সামান্য ভুল করেছ তন্ময়। আমি যা বলেছিলাম তা হল প্রশ্নের একটিই উত্তর। হয় হ্যাঁ কিংবা না। কিন্তু মানুষ যেহেতু অস্বাভাবিক একটি প্রাণী সে দুটি উত্তরই একই সঙ্গে গ্রহণ করে; যদিও সে জানে উত্তর হবে একটি।'

তন্ময় নিশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, এস এক কাজ করা যাক। তোমার সমস্যাটা আমরা একসঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করি। আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হব। আমরা ব্যবহার করব লজিক। লজিক হচ্ছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। লজিকের বাইরে কিছু থাকতে পারে না।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। একটু ঝুঁকে এলেন তন্ময়ের দিকে—

'তন্ময়, তোমার মা খুব ছোটবেলায় তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। তোমার বাবা তোমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তোমাকে বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না। সর্দার নামের একজন লোক রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র তোমাকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। এমনকি স্কুল থেকেও তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হল। একজন মাস্টার দেওয়া হয়েছিল, সেও রইল না। তোমাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণটা কী তন্ময়? এমন কী তোমার আছে যে তোমাকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে?'

'আমি জানি না স্যার।'

মিসির আলি শীতল গলায় বললেন, তন্ময়, তুমি জান।

'না, আমি জানি না।'

'তুমি জান কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। প্রস্তুত নও বলেই তোমার মস্তিষ্কের একটি অংশ ব্যাপারটা জানে না। তোমার অবচেতন মন কারণটা জানে—কিন্তু তোমাকে জানাতে চাচ্ছে না। সমস্যাটা এখানেই। তোমার মস্তিষ্ক ধরে নিয়েছে, কারণ জানলে তোমার প্রচুর ক্ষতি হবে। সে ক্ষতি হতে দেবে না। কাজেই সে তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা শুরু করল। সে ঠিক করল, কোনোদিনই তোমাকে কিছু জানাবে না। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'পারার কথা, মনোবিজ্ঞানের সহজ কিছু প্রিন্সিপালই বলা হচ্ছে। জটিল কিছু নয়। তাই না?'

'হ্যাঁ তাই। Conflict between conscious and sub-conscious.'

'এখন আস দ্বিতীয় ধাপে। এখানে আমরা কী দেখছি? এখানে দেখছি তোমাকে ঘিরে যারা আছেন তাঁরা সরে যাচ্ছেন। প্রথম সরলেন তোমার মা। তিনি দূরে চলে গেলেন। তারপর গেলেন তোমার বাবা, তারপর সর্দার চাচা। এরা কারা? এরা তোমার খুব কাছাকাছির মানুষ। তোমার ভেতরে যে অস্বাভাবিকতা আছে, যে অস্বাভাবিকতার জন্যে তোমাকে আলাদা রাখা হচ্ছে—এঁরা তা জানেন। তোমার মস্তিষ্ক ঠিক করল এদেরও সরিয়ে দেওয়া দরকার। এঁদের সে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দেবার জন্যে একটি ভয়াবহ ব্যাপারের অবতারণা করতে হল—সেই ভয়াবহ ব্যাপার হল মাস্টার সাহেব। তোমার মস্তিষ্ক সেই মাস্টার তৈরি করল।' যে কারণে মাস্টার বারবার বলছে—আমি তোমাকে রক্ষা করব, তোমাকে সাহায্য করব। তোমার মঙ্গল দেখব।'

তন্ময় শীতল গলায় বলল, আমার অস্বাভাবিকতাটা কী?

মিসির আলি বললেন, সেই অস্বাভাবিকতাটা কী আমি নিজে তা ধরতে পারছিলাম না। যখন রানু প্রসঙ্গ এল তখন ধরতে পারলাম—তুমি হচ্ছ একজন অপূর্ণ মানুষ। তুমি পুরুষ নও, নারীও নও। তুমি হলে—Hermaphrodite, বৃহন্নলা। কথ্য বাংলায় আমরা বলি হিজড়া। দেখ তন্ময়! কঠিন সত্য তুমি প্রথম জানলে তোমার বয়ঃসন্ধিকালে। নিজে নিজেই জানলে, কেউ তোমাকে জানায় নি। এই সত্য তুমি গ্রহণ করলে না। তোমার মস্তিষ্ক এই কঠিন সত্য পাঠিয়ে দিল অবচেতন মনে। সেই অবচেতন মনই তৈরি করল মাস্টার। যে মাস্টারের প্রধান কাজ এই সত্য গোপন রাখা। গোপন রাখার জন্যেই সে এই সত্য যারা জানে তাদের একে একে সরিয়ে দিতে শুরু করল। যখন তারা সরে গেল—তোমার অবচেতন মন নিশ্চিন্ত হল। মাস্টার সাহেবের তখন আর প্রয়োজন হল না। দীর্ঘদিন তুমি আর তার দেখা পেলে না। বুঝতে পারছ?

তন্ময় জবাব দিল না।

'আমার লজিকে কি কোনো ভুল আছে?'

তন্ময় তারও জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, আবার সেই মাস্টারের প্রয়োজন পড়ল যখন রানু নামের অসাধারণ একটি মেয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। সে তোমাকে কামনা করছে পুরুষ হিসেবে। তুমি পুরুষ হিসেবে তার কাছে যেতে পারছ না। তুমি কঠিন সত্য তাকে বলতে পারছ না, অন্য একজন পুরুষ এই মেয়েটির কাছে যাক তাও তুমি হতে দিতে পার না, কারণ তুমি এই মেয়েটিকে অসম্ভব ভালবাস। কাজেই আবার মাস্টার জেগে উঠল। তুমিই তাকে জাগালে। তুমিই ঠিক করলে মেয়েটিকে সরে যেতে হবে। তন্ময়!

'জি।'

'তুমি কি এই দৈত্যটাকে বাঁচিয়ে রাখবে না নষ্ট করে দেবে? খুব সহজেই তাকে তুমি ধ্বংস করতে পার। যেই মুহূর্তে তুমি রানুকে গিয়ে তোমার জীবনের গল্প বলবে—সেই মুহূর্ত থেকে মাস্টারের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। রানুর সঙ্গে কি তোমার যোগাযোগ আছে?'

'না। তবে মাঝে মাঝে দূর থেকে আমি তাকে দেখি।'

'সে কি বিয়ে করেছে?'

'না।'

'শোন তন্ময়, গভীর ভালবাসায় এক বর্ষার দিনে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল—তখন তুমি তাকে কঠিন অপমান করেছিলে। এই অপমান তার প্রাপ্য নয়। তোমার কি উচিত না সেই দিনের ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা?'

'হ্যাঁ উচিত।'

'প্রকৃতি তোমার ওপর কঠিন অবিচার করেছে। তোমাকে অপূর্ণ মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সেই প্রতিশোধ তো তুমি মেয়েটির ওপর নিতে পার না! আমি কি ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। আমি রানুকে সব বলব।'

তন্ময় কাঁদছে। মিসির আলি কান্নার শব্দ শুনছেন না, কিন্তু বুঝতে পারছেন। তিনি নিজে অসহায় বোধ করতে শুরু করেছেন।

তন্ময় বলল, স্যার চলুন, আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। তোমার মাস্টার সাহেব যে দোতলায় থাকেন তোমাকে নিয়ে আমি সেখানে যাব। তুমি দেখবে সেখানে কেউ নেই।

'স্যার, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি না।'

'কেন চাচ্ছ না?'

'আমার জীবনের কঠিন এবং ঘৃণ্য সত্য যারা জানে—তারা কেউ বেঁচে নেই। এই সত্য আপনি জানেন। মাস্টার আপনার ক্ষতি করতে পারে।'

মিসির আলি বললেন, মাস্টার বলে যে কিছু নেই তা-ই আমি তোমাকে দেখাব। তুমি আমাকে নিয়ে চল।

১২

গেটের ভেতর পা দিয়ে মিসির আলি চমকে উঠলেন। তাঁর মন বলতে লাগল—কিছু একটা আছে এখানে, কিছু একটা আছে। এখানকার পরিবেশ অন্য রকম। বাতাস পর্যন্ত যেন অন্য রকম। বাগানের জোছনাও এক ধরনের ভয় তৈরি করছে। ন'টা বিরাটাকার কুকুর চেন দিয়ে বাঁধা। তারা একসঙ্গে চাপা গর্জন করছে। সেই গর্জনও কেমন অন্য রকম শোনাচ্ছে।

তন্ময় বলল, মাস্টার সাহেব এখনো আছেন। তিনি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বুঝতে পারছি।

'তোমার মাস্টারের নাম কি তন্ময়?'

'নাম জানি না।'

'নাম জান না তার কারণ তার কোনো নাম নেই—কারণ সে নিজেই নেই। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একা যাব। তারপরে ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'স্যার আপনি যাবেন না।'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'স্যার, মাস্টার সাহেবের অনেক ক্ষমতা।'

'এই ক্ষমতা তুমি তাঁকে দিয়েছ। ক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় হয়েছে। তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।'

মিসির আলি এগিয়ে গেলেন। চাঁদের আলোয় দোতলা বারান্দা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি রেলিঙে হেলান দিয়ে একজন নগ্ন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তামাকের কটু গন্ধও পেলেন। মিসির আলি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছায়ামূর্তি শীতল গলায় বলল, কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?

'ভালো।'

'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

'আমি আছি না নেই?'

'আপনি নেই।'

'তা হলে দেখছেন কী করে?'

'আমার দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে। শারীরিক দিক থেকে আমি খুবই অসুস্থ। তার ওপর তন্ময়ের গল্প আমার ওপর প্রভাব ফেলেছে বলেই হেলুসিনেশন হচ্ছে।'

'বাহ্, যুক্তি সাজিয়েই এসেছেন!'

'আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ, মাস্টার সাহেব।'

'আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার খুব শখ ছিল—আপনি আমার ছাত্রের সমস্যা এত দ্রুত এবং এত সহজে ধরবেন তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি আপনার চিন্তাশক্তির প্রশংসা করছি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'একটি মজার জিনিস কি আপনি লক্ষ করেছেন মিসির আলি সাহেব? আপনি তন্ময়ের শিক্ষক। আমিও তার শিক্ষক। আমি তাকে তার সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্যে আছি। আপনারও একই ব্যাপার।'

'তাই তো দেখছি।'

'আমি প্রচুর সিগারেট খাই আপনিও খান। খান না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উঠে আসুন না। নাকি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

মিসির আলি বললেন, আমি যদি আপনাকে ভয় পাই, তা হলে লজিক বলছে—আপনিও আমাকে ভয় পাবেন।

'হ্যাঁ, লজিক অবিশ্যি তাই বলে। হ্যাঁ মিসির আলি সাহেব, আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি।'

মিসির আলি সিঁড়ির গোড়ার কাঁটাতারের গেটে হাত দিলেন এবং মনে মনে বললেন,

For More Book Download Go To www.missabook.com

তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। You do not exist. তিনি আবারো তাকালেন। বারান্দায় কেউ নেই। ফাঁকা বারান্দায় সুন্দর জোছনা হয়েছে। হাসনাহেনা ফুলের সুবাস আসছে। তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, তন্ময় এস!

তন্ময় আসছে। সে আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। এখন আর হাঁটছে না। সে দোতলায় উঠে এল। সে দাঁড়িয়ে আছে মিসির আলির কাছে। দেব-শিশুর মতো কী সুন্দর মুখ! ঘন কালো চোখ, দীর্ঘ পল্লব।

মিসির আলি মনে মনে বললেন, প্রকৃতি অসুন্দর সহ্য করে না। তারপরেও অসুন্দর তৈরি করে, অসুন্দর লালন করে। কেন করে?

তন্ময় কাঁদছে। তার চোখ ভেজা। মিসির আলির ইচ্ছা করছে ছেলেটিকে বলেন, তুমি কাছে এস, আমি মাথায় হাত রেখে তোমাকে একটু আদর করি।

তিনি বলতে পারলেন না। গভীর আবেগের কথা তিনি কখনো বলতে পারেন না। মিসির আলি তাকালেন উঠোনের দিকে—কামরাঙা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে। কী অসহ্য সুন্দর!

For More Book Download Go To www.missabook.com

For More Book Download Go To www.missabook.com